হযরত আলী (আ.)- এর দৃষ্টিতে

# হযরত মুহাম্মদ (সা.)

নাহজুল বালাগাহ থেকে

মোঃ মুনীর হোসেন খান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

**নামঃ** হযরত আলী (আ.)- এর দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)

( নাহজুল বালাগাহ থেকে)

**অনুবাদঃ** মোঃ মুনীর হোসেন খান

**সম্পাদনাঃ** অধ্যাপক সিরাজুল হক

**তত্ত্বাবধানঃ** ড.মোহাম্মদ রেজা হাশেমী, কালচারাল কাউন্সেলর, ইসলামী ইরান দূতাবাস, ঢাকা- বাংলাদেশ ।

**প্রকাশকালঃ** বৈশাখ ১৪১৩, রবিউল আউয়্যাল ১৪২৭, এপ্রিল- ২০০৬

# প্রকাশকের কথা

মহানবী (সা.) হলেন ইতিহাসের এক বিরল ব্যক্তিত্ব । তিনি এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি উম্মী অর্থাৎ (পৃথিবীর কারো কাছে কিংবা কোন বিদ্যালয়ে) পড়ালেখা করেননি । কিন্তু তিনি ছিলেন জ্ঞানের এক অফুরন্ত উৎস এবং 'ইলমে লাদুন্নীর' অধিকারী । আর এ 'ইলমে লাদুন্নী' স্বয়ং এক প্রাণবন্ত ঝর্ণাধারা যা সর্বদা চিন্তার সমতল প্রান্তরে বারি সিঞ্চন করে কত সবুজ তৃণভূমির তৃষ্ণা মিটিয়েছে । এ 'ইলমে লাদুন্নীর' অধিকারী গুরুর শিষ্যত্ব বরণ করেছে কত জ্ঞান পিপাসু ।

জীবনী গ্রন্থ ও ইতিহাসের সাক্ষী মোতাবেক হযরত আলী (আ.) ছিলেন মহানবী (সা.) এর প্রথম ও শ্রেষ্ঠ শিষ্য । তিনি তার কিশোর বয়সেই পবিত্র ফেতরাতসহ সর্বপ্রথম মহানবী (সা.) এর মাধ্যমে ইলমে লাদুন্নীর অধিকারী হয়েছিলেন । তিনি ছিলেন মহানবী (সা.) এর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য এবং তার অমূল্য জীবনের ফসল । যিনি শিক্ষা গুরুর পরিপূর্ণ দর্পণে পরিণত হয়েছিলেন । আর তাই হযরত আলী (আ.) এর পরিচয় অন্যের নিকট তুলে ধরার জন্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ।

নাহজুল বালাগাহ যা আরবের সাহিত্য সম্রাটগণ কর্তৃক 'আখুল কোরআন' (বা কোরআনের ভাই) বলে আখ্যায়িত হয়েছে তা মূলত হযরত আলী (আ.) এর খুৎবা, উপদেশবাণী এবং ছোট বাক্যসমূহের সমাহার । এ পুস্তিকাটি মহানবী (সা.) এর সমুন্নত জীবনের ভাঙ্গা-গড়া সম্পর্কে আলোকপাত করেছে যা দর্পণের মত মহানবী (সা.) এর সর্বশ্রেষ্ঠ শিষ্য হযরত আলী (আ.) এর দৃষ্টিতে তার (সা.) সমুন্নত বিশেষত্বের প্রতিফলন ঘটিয়েছে ।

১৩৮৫ ফার্সী সনকে ইসলামী বিপ্লবের মহান নেতা, ইসলাম ও মুসলমানদের ঐক্য বিনষ্টকারী শত্রুদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার লক্ষ্যে (মহানবীর (সা.) অবমাননাকর কার্টুন ছবি প্রকাশ করার পর) মহানবী (সা.) এর নামে নামকরণ করেছেন । সে কারণে

এ বছর (১৩৮৫ ফার্সী সন) বাংলাদেশস্থ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দুতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর মহানবী (সা.) এর পরিচিতির ক্ষেত্রে এ মূল্যবান পুস্তিকাটি প্রকাশের পদক্ষেপ নিয়েছে । এ পুস্তিকাটিতে মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ মহানবী (সা.) সম্পর্কে ইমাম আলী (আ.) ও তার অনুসারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে । আশাকরি তা বাংলা ভাষাভাষী ভাই-বোনদের এবং মহানবী (সা.) ও তার আহলে বাইতের (আ.) ভক্তদের জন্য ফলপ্রসু হবে ।

ড.মোহাম্মদ রেজা হাশেমী
কালচারাল কাউন্সেলর
ইসলামী ইরান দূতাবাস
ঢাকা- বাংলাদেশ ।

# হযরত আলী (আ.) এর দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.)

**মূল আরবী থেকে মোঃ মুনীর হোসেন খান কর্তৃক অনূদিত**

মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)। মহান আল্লাহ যদি তাঁকে সৃষ্টি না করতেন তাহলে তিনি এ বিশাল সৃষ্টি জগৎ এ নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কোন কিছুই সৃষ্টি করতেন না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

لولاک لما خلقت الافلاک

"যদি তোমাকে সৃষ্টি না করতাম তাহলে এ নভোমণ্ডলসমূহ সৃষ্টি করতাম না"।

মহান আল্লাহর মনোনীত এ মহামানব আমাদের নবী, আমাদের পথ-প্রদর্শক। আর আমরা যে তাঁর উম্মত হতে পেরেছি এজন্য মহান আল্লাহর নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। স্মতর্ব্য যে, সকল নবী ও রাসূল মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর উম্মত হবার সৌভাগ্য অর্জনের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর আদর্শ শ্রেষ্ঠ আদর্শ, তাঁর সুন্নাত শ্রেষ্ঠ সুন্নাত, তাঁর ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে :

(لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)

''নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল (মুহাম্মদ)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে সুন্দর আদর্শ।''

তাঁর অনুসরণেই আমাদের মুক্তি। তাই তাঁর আদর্শ সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হলে সর্বাগ্রে তাঁকে সঠিকভাবে জানা প্রয়োজন; তাঁর সঠিক পরিচয় আমাদের জানা থাকা উচিত। আর যারা তাঁকে চেনেন এবং জানেন তাঁদের মাধ্যমেই আমরা তাঁর সম্যক পরিচিতি লাভ করতে পারব। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ (যিনি তাঁর স্রষ্টা), মহানবী (সা.) স্বয়ং নিজেই এবং তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং তাঁর হাতে প্রশিক্ষিত মহান আহলুল বাইতকে তিনি মুতাওয়াতির 'হাদীসে সাকালাইন'-এ পবিত্র কোরআনের সমকক্ষ ঘোষণা করেছেন।

তাঁরাই মহানবীর পবিত্র সত্তাকে যথোপযুক্তভাবে ও পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাই মহানবী (সা.) সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য আমাদের কাছে মহানবীর অত্যুজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যাবলী নির্ভুলভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হবে। পবিত্র কোরআন, মহানবীর পবিত্র হাদীস, আহলুল বাইতের বক্তব্য বিশেষ করে হযরত আলীর নাহজুল বালাগাহর বিভিন্ন ভাষণ ও খুতবায় মহানবীর প্রকৃত পরিচয়, মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর নবুওয়াত ও রিসালতের প্রকৃত রূপ, তাঁর নেতৃত্ব ও হেদায়েত এবং সুন্নাহর গুরুত্ব অত্যন্ত নির্ভুলভাবে তুলে ধরা হয়েছে। কারণ হযরত আলী (আ.) ছিলেন শৈশব থেকে মহানবীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লালিত- পালিত। মক্কার তীব্র অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে আবু তালিবের সন্তানদের মধ্যে থেকে মহানবী হযরত আলীর দায়িত্বভার নিয়েছিলেন যেহেতু আবু তালিবের পরিবার ছিল অনেক বড়। আর আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব হযরত জাফর ইবনে আবু তালিবের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এ সময় মহানবী (সা.) বলেছিলেন,

و قد اخترت من اختاره الله لی علیکم علیا

“আমি তাকেই গ্রহণ করেছি যাকে মহান আল্লাহ আমার জন্য তোমাদের উপর উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান সহকারে গ্রহণ ও মনোনীত করেছেন।[১]

এভাবে হযরত আলী (আ.) একেবারে শৈশব থেকেই মহানবীর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত ও বড় হতে থাকেন। মহানবীকে মহান আল্লাহ পাক যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই তিনি হযরত আলীকেও প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলেন। আর ঐ দিন থেকে হযরত আলী মহানবীর ওফাত পর্যন্ত কখনোই বিচ্ছিন্ন হন নি। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী হযরত আলী পিতার তত্ত্বাবধানে পুত্র বা বড় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে যেমন ছোট ভাই প্রতিপালিত হয় ঠিক সেরকমভাবে প্রতিপালিত হন নি। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়টি উল্লেখ করাই যথেষ্ট যে, হযরত আলী মহানবীকে এমন কি হেরা পর্বতের গুহায় নির্জনবাসের সময়ও সঙ্গ দিয়েছিলেন। আর এ কারণেই নবুওয়াতের ঘোষণার পূর্বেই মহানবীর যেসব আত্মিক ও চিন্তাগত বিবর্তন হচ্ছিল তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। হযরত

আলী তাঁর জীবনে এ সকল উজ্জ্বল চিরঞ্জীব দিনগুলো এবং অতি সংবেদনশীল পর্যায়ের কথা এভাবে ব্যক্ত করেছেন :

‘‘আর তোমরা সবাই মহানবীর কাছে আমার নিকটাত্মীয়তা ও বিশেষ মর্যাদাগত অবস্থান সম্পর্কে অবগত আছ। তিনি আমাকে তাঁর কোলে রাখতেন যখন আমি শিশু ছিলাম। তিনি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন এবং তাঁর বিছানায় শুইয়ে রাখতেন। তাঁর পবিত্র দেহ আমার দেহকে স্পর্শ করত এবং তিনি আমাকে তাঁর শরীরের সুগন্ধির ঘ্রাণ নেওয়াতেন। তিনি খাদ্য- দ্রব্য চিবিয়ে আমার মুখে পুরে দিতেন। তিনি আমাকে কখনো মিথ্যা বলতে এবং পাপ করতে দেখেন নি। তিনি প্রতি বছর হেরাগুহায় একান্ত নির্জনে বাস করতেন। আমি তাঁকে দেখতাম। আমি ব্যতীত আর কোন লোকই তাঁকে দেখতে পেত না। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ ও খাদীজাহ্ ব্যতীত কোন মুসলিম পরিবারই পৃথিবীর বুকে ছিল না। আমি ছিলাম তাঁদের পরিবারের তৃতীয় সদস্য। আমি ওহী ও রেসালতের আলো প্রত্যক্ষ করেছি এবং নবুওয়াতের সুবাস ও সুঘ্রাণ অনুভব করেছি।’’[২]

এ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সঃ)- এর সাথে হযরত আলী (আ.)- এর অতি নিবিড় ও আধ্যাত্মিক সম্পর্ক ছিল যা অন্য কোন সাহাবীর সাথে মহানবীর ছিল না। আর এটি হলো মারেফাত অর্থাৎ অধ্যাত্ম জ্ঞানের সর্বোচ্চ পর্যায়। এ কারণেই শৈশব থেকেই হযরত আলী হাকীকতে মুহাম্মদীর সাথে সম্যকভাবে পরিচিত ছিলেন। তাই মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পরই হযরত আলীই সর্বাধিক অগ্রগণ্য ব্যক্তি যিনি মহানবী সম্পর্কে সঠিক তথ্য ও পরিচিতি প্রদান করতে সক্ষম। তাই আমরা হযরত আলীর ভাষণ, অমিয় বাণী ও (প্রেরিত) পত্রাদির সংকলন নাহজুল বালাগাহর বিভিন্ন ভাষণ, অমিয়বাণী ও চিঠি- পত্রে হযরত আলী মহানবী সম্পর্কে যেসব বক্তব্য দিয়েছেন তা এখানে উদ্ধৃত করব। আশা করা যায় যে, আমরা এ থেকে মহানবী (সা.)- এর অতুলনীয় বিশাল ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারব।

**খুতবা ১ থেকে**

মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে [মানব জাতির কাছে] তাঁর ঐশী ওয়াদা বাস্তবায়ন ও নবুওয়াতের ধারার পূর্ণতা প্রদান করার জন্য প্রেরণ করেছেন। পূর্ববতী সকল নবীর কাছ থেকে তাঁর (মহানবীর) নবুওয়াত ও শরীয়তের অনুসরণের অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে। তাঁর নিদর্শনসমূহ খ্যাতি লাভ করেছে (সকল নবীর কাছে এবং পূর্ববর্তী সকল আসমানী গ্রন্থ ও সহীফাতে)। তাঁর জন্ম অত্যন্ত পবিত্র ও মহান সে দিন (যখন মহানবী প্রেরিত হয়েছিলেন মানবমণ্ডলীর কাছে) জগতবাসিগণ ছিল বিভিন্ন ধর্ম ও ফিরকায় বিভক্ত। রিপু ও প্রবৃত্তিসমূহ ছিল ব্যাপক প্রসারিত। তাদের মত ও পথসমূহ ছিল বিভিন্ন ধরনের। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল মুশাব্বিহা (মহান আল্লাহকে তাঁরই সৃষ্টির সাথে তুলনা করত) অথবা কেউ কেউ মহান আল্লাহর পবিত্র নামের ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বিষয়কে বৈধ মনে করেছে। (তাঁর পবিত্র নামসমূহ বিকৃত করেছে অথবা পবিত্র নামসমূহকে অস্বীকার করেছে অথবা পবিত্র নামের স্থলে অন্য কোন নাম চালিয়ে দিয়েছে) অথবা কেউ কেউ ছিল গায়রুল্লাহর প্রতি ভক্ত ও অনুরক্ত।

মহান আল্লাহ তাঁর (হযরত মুহাম্মদ) মাধ্যমে মানব জাতিকে পথভ্রষ্টতা থেকে হেদায়েত করলেন। তাঁর মাধ্যমে মানব জাতিকে অজ্ঞতা ও মূর্খতা থেকে মুক্তি দিলেন। এরপর মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে তাঁর নিজ দীদার ও সাক্ষাতে আনার জন্য মনোনীত করলেন। স্রষ্টা তাঁর কাছে যা আছে তা হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর জন্য কবুল করে নিলেন। তাঁকে (সা.) পার্থিব জগৎ থেকে সম্মান সহকারে পরপারে নিয়ে গেলেন। তিনি বিপদাপদের পর্যায় থেকে তাঁকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিলেন। এরপর মহান আল্লাহ তাঁকে সম্মান ও মর্যাদাসহকারে নিজের সান্নিধ্যে আনলেন। পূর্ববর্তী সকল নবী তাঁদের উম্মতের মাঝে যা রেখে গিয়েছেন সেটিই তিনিও তোমাদের মাঝে রেখে গেছেন। কারণ মহান নবীগণ কখনোই সুস্পষ্ট পথ ও প্রতিষ্ঠিত হেদায়েতের নিদর্শন ব্যতীত তাদের নিজ নিজ জাতিকে তাদের নিজেদের ঘাড়ে ছেড়ে দিয়ে ইহজগৎ থেকে বিদায় নেন নি।

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যাঁর প্রশংসা করতে অক্ষম কথকগণ (প্রশংসাকারিগণ), আর গণনাকারিগণ যার নেয়ামতসমূহ গণনা করতে অক্ষম, আর যার অধিকার প্রদান করতে অপারগ সকল চেষ্টাসাধনাকারিগণ অর্থাৎ অধিকার আদায়কারিগণ। চিন্তা- ভাবনা দিয়ে ও আকাংখা দিয়ে

আর গভীর বুদ্ধিমত্তা দিয়েও যার নাগাল পাওয়া যায় না, যাঁর গুণের কোন সীমা- পরিসীমা নেই, নেই বিদ্যমান কোন বর্ণনা, নেই কোন সংকীর্ণ সংক্ষিপ্ত কাল, ঠিক তেমনি নেই কোন দীর্ঘ সময় ও কাল (যিনি কালের গতি ও সীমারেখার ঊর্ধ্বে) যিনি স্বীয় শক্তি ও মহিমা দিয়ে সৃষ্টিসমূহকে সৃষ্টি করেছেন, স্বীয় করুণা ও দয়া দিয়ে বাতাসকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন এবং পৃথিবীর ভূ- ত্বকের গতি স্থানান্তর ও কম্পনকে বৃহদাকার গিরি পর্বতমালা ও পাথরসমূহ দিয়ে গেঁথে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন।

**খুতবা ২ থেকে**

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল (প্রেরিত পুরুষ)। তিনি তাঁকে প্রসিদ্ধ ধর্ম (ইসলাম) বর্ণিত নিদর্শন, সুস্পষ্টাক্ষরে লিখিত গ্রন্থ (পবিত্র কোরআন) হেদায়েতের অত্যুজ্জ্বল আলো, ঔজ্জ্বল্য বিচ্ছুরণকারী দ্যুতি ও অকাট্য বিধি- বিধানসহকারে সকল ক্লান্তি নিরসন, ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা পূরণ, নিদর্শনাদি দ্বারা সতর্কীকরণ এবং ইহলৌকিক- পারলৌকিক শাস্তিসমূহের দ্বারা ভীতি- প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে মহান আল্লাহ ঐ অবস্থায় প্রেরণ করেছেন যখন মানুষ এমন সব ফিতনায় নিমজ্জিত ছিল যা ধর্মের রজ্জুকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলেছিল, দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থার সকল স্তম্ভকে নড়বড়ে করে দিয়েছিল; তখন মূল পৃথক ও ছিন্ন ভিন্ন এবং একতা (এক- একক বিষয়) টুকরো টুকরো ও বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। নির্গমন পথ সংকীর্ণ এবং উৎসমূল অন্ধত্বের শিকার হয়ে গিয়েছিল। তখন সুপথ অখ্যাত- অজ্ঞাত ও অন্ধত্ব সব কিছুকে ঘিরে ফেলেছিল; শয়তান সাহায্যপ্রাপ্ত হচ্ছিল ও ঈমানের অবমাননা করা হচ্ছিল; তাই ঈমানের স্তম্ভসমূহ ধ্বসে গিয়েছিল এবং এর চিহ্ন ও নিদর্শনাবলী উপেক্ষিত হয়েছিল। এর (ঈমানের) পথসমূহ পুরানো এবং নষ্ট ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল মানবমণ্ডলী (বিশেষ করে আরব জাতি) তখন শয়তানের আনুগত্য করত এবং তার পথেই চলত। আর (এভাবে) তারা (মানবমণ্ডলী) তার ভাগ্যস্থলেই প্রবেশ করেছে শয়তানের নিদর্শনাদি তাদের মাধ্যমেই প্রসার লাভ করেছিল, তাদের (অনুসারীদের) মাধ্যমে

তার (ইবলিসের) বিজয় পতাকা উত্তোলিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারা (মানব জাতি) ছিল এমন সব ফিতনায় (নিমজ্জিত) যা তাদেরকে খুর দিয়ে দলিত- মথিত ও পিষ্ট করেছিল এবং (ফিতনাসমূহ) এর ধারালো পার্শ্বদেশের ওপর ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই তারা (মানব জাতি) ফিতনাসমূহে অস্থির, বিচলিত, উদভ্রান্ত, পথভ্রষ্ট, অজ্ঞ ও বিপথগামী হয়ে পড়েছিল; উত্তম কল্যাণকর গৃহে (পবিত্র কাবা) ও নিকৃষ্ট প্রতিবেশীর (মুশরিক কুরাইশ) মধ্যে থেকেও তখন তারা ফিতনাগ্রস্ত ও অপদস্থ হচ্ছিল। তখন তাদের নিদ্রা- অনিদ্রা ও জাগরণে পরিণত হয়েছিল; আর তাদের চোখের সুরমা হয়ে গিয়েছিল তাদের নয়নাশ্রু; তারা এমন ভূ-খণ্ডে বসবাস করত যেখানে জ্ঞানীরা ছিল লাগাম পরিহিত (অর্থাৎ তারা ছিল সেখানে অপমানিত ও অসম্মানিত এবং তাদেরকে সত্য কথা বলতে দেয়া হত না) এবং অজ্ঞ- মূর্খরা ছিল সম্মানের পাত্র।

**খুতবা ২৬ থেকে**

মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে জগৎসমূহের ভয় প্রদর্শনকারী এবং অবতীর্ণ ওহীর বিশ্বস্ত সংরক্ষক হিসেবে ঐ অবস্থায় প্রেরণ করেছেন যখন হে আরবগণ, তোমরা ছিলে নিকৃষ্ট ধর্মের অনুসারী এবং নিকৃষ্ট বাসগৃহে (বাস করতে) তোমরা কঠিন পাথর ও বধির সর্পকুলের (ঐ সব সর্পকে বধির বলা হয়েছে যেগুলো খুবই ভয়ানক ও অত্যন্ত বিষাক্ত এবং প্রচণ্ড শব্দ ও বিকট আওয়াজেও ভয় পেয়ে পলায়ন করে না যেন এগুলো কালা- বধির এবং শুনতে পায় না।) মধ্যে বসবাস করতে; তোমরা নোংরা ঘোলা পানি পান করতে; তোমরা ব্যঞ্জনবিহীন গুরুপাক ও অপবিত্র খাদ্য খেতে; তোমরা নিজেদের মধ্যে রক্তপাত করতে এবং আত্মীয়তা ও রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে. তোমাদের মধ্যে মূর্তি ও প্রতিমাসমূহ (এবং এগুলোর পূজা- উপাসনা) প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং পাপাচার তোমাদেরকে দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরে রেখেছিল (অর্থাৎ তোমরা সবাই তখন পাপাচারে লিপ্ত ছিলে)।

**খুতবা ৩৩ থেকে**

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে প্রেরণের অন্তর্নিহিত কারণ ও প্রজ্ঞা : নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে ঐ অবস্থায় প্রেরণ করেছিলেন যখন কোন আরবই গ্রন্থ পাঠ করতে জানত না এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ নবুওয়াতের দাবীও করেনি। মহানবী (সা.) জনগণকে পথ প্রদর্শন করে তাদেরকে নিজ নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং তাদেরকে তাদের নাজাতের (মুক্তির) স্থানে পৌঁছে দিলেন। এর ফলে তাদের শক্তি, ক্ষমতা ও রাষ্ট্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল এবং তাদের সার্বিক অবস্থা ও চারিত্রিক গুণাবলীও স্থিরতা লাভ করল।

**খুতবা ৭২ থেকে**

হে আল্লাহ, আপনার (মনোনীত) শ্রেষ্ঠ মর্যাদাসম্পন্ন সালাম ও সালাত (দরুদ) এবং অধিক অধিক বরকত ও কল্যাণ আপনার বান্দা ও রসূল হযরত মুহাম্মদের (সা.) ওপর প্রেরণ করুন যিনি ছিলেন পূর্ববর্তী সকল নবুওয়াতের পরিসমাপ্তকারী (সর্বশ্রেষ্ঠ নবী) এবং যা আবদ্ধ ও তালাবদ্ধ ছিল তা উন্মুক্তকারী।(হেদায়েত অর্থাৎ সুপথ থেকে বিচ্যুত হওয়ার মাধ্যমে মানব মনের দরজাসমূহ তালাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মহানবী (সা.) তাঁর নবুওয়াতের উজ্জ্বল নিদর্শনাদির মাধ্যমে সেসব তালাবদ্ধ হৃদয়কে উন্মুক্ত করেছিলেন।)তিনি (সা.) সত্য দিয়েই সত্যের ঘোষণা দিয়েছেন এবং বাতিল পথভ্রষ্টদের সকল সেনাবাহিনীকে তিনি প্রতিহত করেছেন। তিনি পথভ্রষ্টদের সমুদয় প্রভাব- প্রতিপত্তি ধ্বংস

করেছেন ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন। যেভাবে তাঁকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ঠিক সেভাবেই তিনি তা দৃঢ়তার সাথে পালন করেছেন। তিনি (সা.) আপনার নির্দেশ পালন করেছেন এবং আপনার সন্তুষ্টি (অর্জনের) ক্ষেত্রে ত্বরা করতেন। তিনি (সা.) রণাঙ্গনের উদ্দেশে যাত্রা করার ক্ষেত্রে কখনো কাপুরুষতা ও ভীরুতা প্রদর্শন করেন নি এবং দৃঢ় সংকল্প ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও কোন দুর্বলতা দেখান নি। তিনি আপনার ওহী পূর্ণরূপে আত্মস্থ ও হৃদয়ঙ্গম করে তা হেফাযত করেছেন এবং আপনার প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকার রক্ষা করেছেন। তিনি আপনার আদেশ- নিষেধ বাস্তবায়ন

করার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন যার ফলে তিনি হেদায়েতের আলোক শিখা প্রজ্জ্বলিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং (আঁধার) রাতে অস্পষ্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে চলাচলকারী পথিকের চলার পথ আলোকোজ্জ্বল করেছিলেন। ফিতনা ও পাপাচার প্রশমিত হওয়ার পর তাঁর দ্বারা অন্তঃকরণসমূহ সুপথপ্রাপ্ত হয়েছিল। তিনি (সা.) হেদায়েতের স্পষ্ট নিদর্শনাদি ও আলোকোজ্জ্বল বিধিবিধানসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই তিনি আপনার একান্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বান্দা, আপনার সংরক্ষিত জ্ঞানের ধারক (মহান আল্লাহ এই সংরক্ষিত জ্ঞান থেকে বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে বিশেষভাবে দান করেন।) এবং শেষ বিচার দিবসে আপনার সাক্ষী(মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানব জাতির ওপর তিনি (সা.) সাক্ষী। এতদপ্রসঙ্গে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, “অতঃপর তখন অবস্থা কেমন হবে যখন আমরা প্রতিটি জাতি অর্থাৎ উম্মাত থেকে একজন করে সাক্ষী আনয়ন করব এবং আপনাকে এদের সকলের ওপর সাক্ষী হিসেবে নিযুক্ত করব?”)

## মহানবীর জন্য দোয়া

হে আল্লাহ, আপনার করুণা ও দয়ার ছায়ায় তাঁর (সা.) স্থানকে প্রশস্ত করে দিন; আর তাঁকে (সা.) আপনার অনুগ্রহ থেকে অশেষ পুণ্য ও কল্যাণ দান করুন। হে আল্লাহ, তাঁর স্থাপনা ও ইমারতকে সকল নির্মাতার স্থাপনা ও ইমারতের চেয়ে উচ্চ করে দিন। আপনার কাছে তাঁর মর্যাদা ও স্থানকে উচ্চ ও সম্মানিত করে দিন। তাঁর আলোকে তাঁর জন্য পরিপূর্ণ করে দিন, তাঁকে মানব জাতির কাছে নবুওয়াত ও রিসালত সহকারে আপনার পক্ষ থেকে প্রেরণ করার জন্য তাঁর সাক্ষ্য কবুল এবং তাঁর কথায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে তাঁকে পুরস্কৃত করুন। কারণ তাঁর কথা ন্যায়ভিত্তিক এবং তাঁর ফয়সালা ও রায় সুস্পষ্ট ও চূড়ান্ত। হে আল্লাহ, আমাদেরকে ও তাঁকে জীবনের (নির্মল) আনন্দ, চিরস্থায়ী নিয়ামত, আশা- আকাঙ্ক্ষায় সন্তুষ্টি প্রকাশ, অনাবিল আনন্দ উপভোগ, চিত্তের প্রশান্তি, সুখ- স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্মানের উপঢৌকনাদি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একত্রে রাখুন।

**খুতবা ৭৭ থেকে**

বনু উমাইয়্যা আমাকে অল্প অল্প করে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর উত্তরাধিকারের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করছে; আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে কসাই যেমন বালু- মাখা মাংস থেকে বালু ঝেড়ে ফেলে ঠিক তেমনি আমি তাদেরকে ঝেড়ে ফেলব (অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান করব, দূরে তাড়িয়ে দেব এবং তাদের থেকে হযরত মুহাম্মদ [সাঃ]- এর উত্তরাধিকারকে পৃথক করব)।

**খুতবা ৮৯ থেকে**

মহান আল্লাহ তাঁকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে] রাসূলদের তিরোধানের বেশ কিছু সময়ের ব্যবধানে (এ পৃথিবীতে) প্রেরণ করেছেন। তখন জাতিসমূহ (অসচেতনতার) গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল। ফিতনাসমূহ স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল এবং মানব জাতির সার্বিক বিষয়াদি ছিল ইতস্তত বিক্ষিপ্ত।

যুদ্ধের লেলিহান শিখা (পৃথিবীর সর্বত্র) প্রজ্জ্বলিত ছিল। পৃথিবীর জীবনপত্র তখন হলুদ হয়ে গিয়েছিল, এর ফলবান হওয়ার কোন আশাই ছিল না এবং এর সকল (প্রাণ সঞ্জীবনী) জলধারাও নিঃশেষ ও শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল। এ কারণে পৃথিবী তখন (হেদায়েতের) আলোকে ঢেকে রেখেছিল এবং প্রকাশ্যে প্রবঞ্চনা দিচ্ছিল। তখন হেদায়েতের (সুপথ- প্রাপ্তির) সুউচ্চ মিনার পুরানো ও জীর্ণ- বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আর পথভ্রষ্টতার চিহ্ন ও নিদর্শনসমূহ প্রকাশ্যে বিরাজমান ছিল। পৃথিবী তখন নিজ অধিবাসীদেরকে কুৎসিত চেহারা সহকারে বরণ করত এবং এর সন্ধানকারীদের প্রতি তীব্র ভ্রুকুটি করত। তখন ফিতনাই ছিল পৃথিবীর একমাত্র ফল এবং মৃত লাশই ছিল এর (অধিবাসীদের) খাদ্য [আসলে এখানে হযরত আলী (আ.) তীব্র খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ ও সংকটের কারণে আরব জাতি যে মৃত পশু ভক্ষণ করত সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।] আর ভয়- ভীতি পৃথিবীর (পার্থিব জীবনের) অন্তর্বাস ও তরবারি এর উর্ধ্ববরণ ও চাদরে পরিণত হয়েছিল। (অর্থাৎ ভয়- ভীতি, ত্রাস, যুদ্ধ- বিগ্রহ, হানাহানি, রক্তপাত ও অশান্তি তখনকার পৃথিবী ও পার্থিব জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা ও অবিচ্ছেদ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। কাপড় যেমন দেহের সাথে লেগে থাকে ঠিক তেমনি ভয়- ভীতি যেন জীবনের নিত্য সঙ্গী হয়ে গিয়েছিল। আর উর্ধ্ববরণ ও চাদরের মত তরবারি তখনকার পার্থিব জীবনের উর্ধ্ববরণী পোশাকে পরিণত হয়েছিল।)

**খুতবা ৯৪ থেকে**

মহান আল্লাহর অসীম করুণা ও দয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর কাছে পৌঁছালো ও সর্বোৎকৃষ্ট খনি (বংশ) এবং সবচেয়ে সম্মানিত উৎসমূল থেকে অর্থাৎ বৃক্ষবৎ পবিত্র বংশধারা যা থেকে তিনি মহান নবীদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর পবিত্র আমানতের সংরক্ষণকারী বিশ্বস্ত ব্যক্তিদেরকে মনোনীত করেছেন তা থেকেই তাঁকে বের করলেন। তাঁর বংশধরগণ (ইতরাত) সর্বশ্রেষ্ঠ বংশধারা যা (মহান আল্লাহর) সংরক্ষিত পবিত্র স্থানে জন্মেছে এবং বদান্যতা ও পবিত্রতায় যা সুউচ্চ হয়েছে। বৃক্ষবৎ এই পবিত্র বংশধারার রয়েছে বহু দীর্ঘ- প্রশস্ত ডাল- পালা ও শাখা- প্রশাখা এবং এমন একটি ফল যা ধরা যায় না। তাই তিনি মুত্তাকীদের নেতা (ইমাম) এবং যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত

হয়েছে তাদের চোখের দ্যুতি। তিনি এমন এক প্রদীপ যার দ্যুতি ও প্রভাব প্রকাশিত (প্রকাশ্যে বিরাজমান) এবং উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক যার আলো সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং বিস্তার লাভ করেছে। তিনি সর্বোৎকৃষ্ট (চন্দন) কাঠসদৃশ, আগুনের সংস্পর্শে আসলেই যার প্রভাব ও দ্যুতির চমকানিতে সব কিছু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাঁর সিরাত অর্থাৎ জীবন যাপন পদ্ধতি ও অভ্যাস মধ্যপন্থা ও সরল সঠিক পথ। তাঁর সুন্নাহ্ই (আদর্শ) সুপথ প্রাপ্তি। তাঁর বাণী স্পষ্ট মীমাংসাকারী। তাঁর বিচারই ন্যায়পরায়ণতা (আদল)। মহান আল্লাহ তাঁকে রাসূলদের বিদায়ের বেশ কিছুকাল পরে সৎ কাজ (পূর্ববর্তী নবী- রাসূলদের সুন্নাহ্) থেকে জাতিসমূহ যখন বিমুখ ও অজ্ঞ ছিল ঠিক তখনই প্রেরণ করেন।

**খুতবা ৯৫**

এ খুতবায় হযরত আলী (আ.) মহানবীর মহৎ গুণাবলী উল্লেখ করেছেন

মহান আল্লাহ এমন এক সময় মহানবী (সা.)- কে প্রেরণ করেছিলেন যখন সমগ্র মানব জাতি উত্তেজনা ও জটিলতার মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল এবং ফিতনার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছিল। প্রবৃত্তির কামনা- বাসনা বিবেক- বুদ্ধি লোপ করে দিচ্ছিল এবং অহংকার ও গর্ব তাদেরকে পদস্খলিত করেছিল। চরম অজ্ঞতা ও মূর্খতা তাদেরকে নির্বোধ ও হীন করে ফেলেছিল। তখন লোকেরা বিশৃঙ্খলা ও অজ্ঞতার অমানিশায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হয়রান হয়ে পড়েছিল। এরপর মহানবী মানব জাতিকে সদুপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে (পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে) যথাসাধ্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করলেন। তিনি নিজে সৎ পথের ওপর অবিচল থেকে (মানব জাতিকে) প্রজ্ঞা, সদুপদেশ ও সুপরামর্শের দিকে আহবান জানালেন।

**খুতবা ৯৬ থেকে**

তাঁর (মহানবীর) বাসস্থান ও আবাসস্থল সর্বোত্তম বাসস্থান ও আবাসস্থল। যাবতীয় সম্মান ও মর্যাদার খনি এবং নিরাপত্তার ক্রোড়সমূহের মধ্যে তাঁর উৎসমূলই শ্রেষ্ঠ। পুণ্যবানদের হৃদয় তাঁর

দিকেই ঝুঁকেছে এবং (মানব জাতির) দৃষ্টি তাঁর দিকেই নিবদ্ধ হয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর দ্বারা সকল হিংসা- বিদ্বেষ ও ঘৃণা দাফন করেছেন এবং (সকল) পারস্পরিক শত্রুতা ও জিঘাংসার বহ্নিশিখা নির্বাপিত করেছেন। তাঁর মাধ্যমে মহান আল্লাহ মুমিনদেরকে ভ্রাতৃসুলভ বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন এবং যারা (কুফরী ও খোদাদ্রোহিতায়) ঐক্যবদ্ধ ছিল তাদেরকে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন করেছেন। যারা অসম্মানিত, অপদস্থ ছিল মহান আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে তাদের সম্মানিত করেছেন এবং (মিথ্যা) গৌরব ও সম্মানকে অপদস্থ ও হেয় করেছেন। তাঁর বাণী ও কথা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং তাঁর মৌনতা ও নীরবতা গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত বাণীসম।

**খুতবা ১০০**

এ খুতবাটি মহানবী ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইত প্রসঙ্গে

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি তাঁর কৃপা তাঁর সমগ্র সৃষ্টিকুলে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাদের প্রতি তাঁর অবারিত দানের হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছেন। আমরা তাঁর সকল কর্মকাণ্ডে তাঁরই প্রশংসা করি এবং আমরা যাতে (আমাদের ওপর) তাঁর অধিকারসমূহ যথাযথভাবে আদায় ও সংরক্ষণ করতে পারি সেজন্য তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি। আমরা সাক্ষ্য প্রদান করি, তিনি ব্যতীত আর কোন ইলাহ্ (উপাস্য) নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁরই বান্দা ও রাসূল। মহান আল্লাহ তাঁকে (বাতিল- মিথ্যার প্রাচীর) ধ্বংসকারী এবং তাঁর স্মরণ উজ্জীবনকারী হিসেবে তাঁর দীন (ঐশী আদেশ- নির্দেশ)সহ (মানব জাতির কাছে) প্রেরণ করেছেন। এরপর তিনি পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে স্বীয় রিসালতের দায়িত্ব পালন করেছেন এবং (সমগ্র জীবনব্যাপী) সুপথের ওপর অবিচল থেকেছেন। তিনি আমাদের মাঝে সত্যের পতাকা (আহলে বাইত) উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে গেছেন। যারা এই সত্যের পতাকা ও নিশান থেকে অগ্রগামী হবে তারাই (দীন থেকে) খারিজ হয়ে যাবে; আর যারা এ থেকে পিছে পড়ে থাকবে তারাও ধ্বংস হয়ে যাবে; আর যারা এর সাথে (সত্যের পতাকার সাথে) লেগে থাকবে (অর্থাৎ সত্য ও সত্যপন্থীদেরকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখবে) তারাই (সত্যের সাথে) থাকবে। সত্যের নিশানের

সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে, তারা কথা বলার ক্ষেত্রে স্থির, প্রশান্ত, গভীর, ধীর স্থিরভাবে ও বিচক্ষণতার সাথে কাজ করে (অর্থাৎ নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতার সাথে কাজ করে না এবং যখন সামর্থ্য অর্জিত হয় কেবল তখনই কাজ করে) আর তারা খুবই দ্রুত কর্ম সম্পাদন করে যখন কোন কাজ করার উদ্যোগ নেয়। যখন তোমরা তাঁর (মহানবী) সামনে তোমাদের গ্রীবাদেশ আনুগত্যের সাথে ঋজু করেছো এবং তাঁর দিকে তোমাদের অঙ্গুলি নির্দেশ করেছো ঠিক তখনই তাঁর কাছে মৃত্যু উপস্থিত হলো এবং তিনি পরপারে চলে গেলেন। অতঃপর এমন এক ব্যক্তি যিনি তোমাদেরকে সংঘবদ্ধ (করবেন) এবং তোমাদেরকে বিক্ষিপ্ততা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে একত্র করবেন তাকে বের করে আনা পর্যন্ত মহান আল্লাহ যতদিন চাইলেন ততদিন তোমরা বেঁচে রইলে। তাই যে সামনে এগিয়ে আসে না, তার ব্যাপারে অযথা কিছু প্রত্যাশা করো না আর যে পশ্চাতে গমন করে অর্থাৎ পেছনে ফিরে যায় তার প্রতিও নিরাশ হয়ো না। কারণ সম্ভবত পশ্চাতে গমনকারীর দু'পায়ের একটি স্খলিত ও স্থানচ্যুত হলেও অন্যটি অবিচল ও যথাস্থানেই স্থির থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না উভয় পা যথাস্থানে প্রত্যাবর্তন করে ঠিক হয়ে না দাঁড়ায়। জেনে রাখো, হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর পবিত্র আহলে বাইতের উপমা হচ্ছে আকাশের নক্ষত্রতুল্য। একটি নক্ষত্র অস্ত গেলে অন্য একটি উদিত হয়। তাই যেন তোমাদের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর তরফ থেকে তাঁর নেয়ামতসমূহ পূর্ণতা লাভ করেছে এবং তোমরা যা চাইতে ও আকাংক্ষা করতে তিনি (আল্লাহ) তা তোমাদেরকে দেখিয়েছেন।

**খুতবা ১০৪**

নিশ্চয় মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে এমন এক সময় প্রেরণ করেছিলেন যখন আরবের কোন ব্যক্তি না পড়তে পারত, আর না নবুওয়াত ও ওহীরও দাবী করত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যারা তাঁর আনুগত্য করেছিল তাদের সাহায্যে, যারা তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। আর এভাবে তাদেরকে তাদের নাজাতস্থলে পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং তাদের ওপর মৃত্যু অকস্মাৎ এসে পড়ার আগেই তাদেরকে অতি দ্রুত উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু ক্লান্ত- শ্রান্ত

ব্যক্তি আরো ক্লান্ত ও দুর্বল হয়েছে আর দুর্বল আকীদা- বিশ্বাস পোষণকারী ব্যক্তিই মুমিনদের পথে পথ চলা থেকে থমকে দাঁড়িয়েছে এবং তার চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যাত্রা বিরতির ওপরই বহাল থেকেছে। তার মধ্যে কোন মঙ্গল ও কল্যাণ নেই। পরিণামে তিনি তাদেরকে (পথহারা, বিপথগামী, পথভ্রষ্ট আরব জাতিকে) তাদের মুক্তির পথ দেখিয়েছেন, তাদের সবাইকে তাদের নিজ নিজ স্থানে সংস্থাপন করেছেন। আর এর ফলে তাদের জীবন চাকা সচল ও আবর্তিত (হয়েছে) [অর্থাৎ তাদের সার্বিক ভাগ্যোন্নয়ন হয়েছে এবং তাদের জীবিকায় প্রাচুর্য এসেছে] এবং তাদের সার্বিক অবস্থা ভালো এবং শক্তিশালী হয়েছে। মহান আল্লাহর শপথ, আমি ছিলাম সেই পর্যন্ত তাদের সৈন্যবাহিনীর অগ্রবর্তী অংশের অন্তর্ভুক্ত রক্ষাকারী অতন্দ্র প্রহরী যে পর্যন্ত না তারা (আরব জাতি) [হেদায়েত ও ঈমানের পথে] সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে (একতা ও ঐক্যের) রজ্জুতে জমায়েত হয়েছিল (অর্থাৎ তারা ঈমানের দিকে ফিরে এসেছিল এবং ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল)। আমি কখনো দুর্বলতাও দেখাইনি এবং কাপুরুষতাও প্রদর্শন করিনি। আর না আমি কখনো স্বীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে অলস ও শিথিল হয়েছি। মহান আল্লাহর শপথ, আমি অবশ্যই বাতিল- অসত্য অন্যায়কে চিরে ফেলে এর পাঁজর থেকে সত্যকে বের করে আনবোই।

**খুতবা ১০৫ থেকে**

মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন শৈশবে সমগ্র সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোত্তম এবং বয়স্কাবস্থায় তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভদ্র। তিনি ছিলেন স্বভাব- চরিত্রে সকল পবিত্র ব্যক্তিত্বদের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র। তিনি ছিলেন স্থায়ী ও অবিরাম বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘমালার মত দানশীলদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ (দানশীল) [অর্থাৎ যেসব মেঘ থেকে অবিরাম স্থায়ীভাবে বৃষ্টি বর্ষণ হতে থাকে সেসব মেঘের মত যারা স্থায়ীভাবে দান করে যায় তাদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ ছিলেন।]

**খুতবা ১০৬ থেকে**

তিনি (হযরত মুহাম্মদ) সত্যের সন্ধানকারীদের জন্য (হেদায়েতের) অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন এবং পথহারা উষ্ট্র আবদ্ধকারী ব্যক্তিদের অর্থাৎ বিপথগামীদের জন্য আলোকবর্তিকা স্থাপন করেছিলেন (অর্থাৎ মরু প্রান্তরে পথহারা উষ্ট্রচালক দিশেহারা হয়ে স্বীয় উষ্ট্রী বেঁধে রাখে এবং জানেও না যে, কিভাবে সে পথ চলবে তাই সে পথ চলা ক্ষান্ত দেয়। তাই এদের জন্য পথ চলতে সহায়ক আলোকোজ্জ্বল পতাকা বা আলোকবর্তিকা স্থাপন করা হয় ঠিক তেমনি তিনি বিপথগামীদের পথের সন্ধান এবং সঠিক পথে চলার জন্য হেদায়েতের আলোকবর্তিকা ও পতাকা স্থাপন করেছিলেন)। তাই এ কারণেই তিনি আপনার একান্ত বিশ্বস্ত আমানতদার, শেষ বিচার দিবসে আপনার সাক্ষী, নেয়ামতস্বরূপ আপনার প্রেরিত (নবী) এবং আপনার রহমতস্বরূপ সত্য রাসূল। হে আল্লাহ, আপনার আদালত অর্থাৎ ন্যায়-বিচার থেকে তাঁকে যথার্থ প্রাপ্য প্রদান করুন। আপনার অপার করুণা থেকে অগণিত কল্যাণ ও মঙ্গল দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করুন। হে আল্লাহ, সকল নির্মাতার (নির্মিত) ভবনসমূহের চেয়েও তাঁর ভবন বা ইমারতকে উঁচু করুন। আর আপনার কাছে তাঁর আগমনকে সম্মানিত করুন এবং আপনার কাছে তাঁর অবস্থানকে মর্যাদাপূর্ণ করে দিন। তাঁকে ওয়াসীলাহ্ দান করুন। তাঁকে উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানে অধিষ্ঠিত করুন। আমাদেরকে তাঁর সাথে এমতাবস্থায় (কিয়ামত দিবসে) পুনরুজ্জীবিত করুন যাতে করে আমারা লজ্জিত, অনুতপ্ত, (সত্য থেকে) বিচ্যুত, প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী, বিপথগামী, বিচ্যুতকারী ও প্রলোভিত না হই।

**খুতবা ১০৮**

মহান আল্লাহ তাঁকে [হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে] নবীদের পবিত্র বৃক্ষ থেকে, আলোর প্রদীপ থেকে, সুউচ্চ আকাশের মত মর্যাদা ও মহত্ত্বের শীর্ষদেশ থেকে, বাতহা'র প্রাণকেন্দ্র (পবিত্র মক্কা) থেকে অন্ধকারের প্রদীপ এবং প্রজ্ঞার প্রস্রবণ ও উৎস থেকে নির্বাচিত ও মনোনীত করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ ছিলেন ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক যিনি রোগের উপশম দানকারী মলম প্রস্তুত করে রাখতেন এবং ক্ষতস্থানে দাগ লাগানোর যন্ত্রকে উত্তপ্ত রাখতেন। যখনই অন্ধ হৃদয়, বধির কান ও বাকশক্তিহীন জিহ্বার চিকিৎসার প্রয়োজন হতো তখনই তিনি এগুলো (অর্থাৎ চিকিৎসার এসব উপায়- উপকরণ) দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতেন। তিনি অবহেলা- অমনোযোগ ও জটিলতার স্থানসমূহে গভীরভাবে অনুসন্ধান করে (সঠিক) ঔষধ প্রয়োগ করতেন।

**খুতবা ১০৯ থেকে**

তিনি দুনিয়ার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছিলেন এবং একে অতি তুচ্ছ ও গুরুত্বহীন মনে করতেন। তিনি জেনেছিলেন, মহান আল্লাহ ইচ্ছা করেই তাঁর নিকট থেকে দুনিয়াকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন এবং একে অবজ্ঞাকারে অন্যদের জন্য প্রশস্ত করেছেন। তাই তিনি মনে- প্রাণে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং হৃদয় থেকে এর সকল স্মৃতিচিহ্ন ও স্মরণ মুছে ফেলেছিলেন যাতে করে এ দুনিয়া থেকে গর্ব ও গৌরবের কোন পোশাক তাঁর পরিধান করতে না হয় অথবা এ দুনিয়ায় তাঁর যেন কোন পদ মর্যাদা ও আসনের লোভ ও আশার সৃষ্টি না হয়। সেজন্য তিনি চাইতেন এবং কামনা করতেন যেন তাঁর দৃষ্টি থেকে এর সকল রূপ- রস ও সৌন্দর্য বিদূরিত ও বিলীন হয়ে যায়। তিনি তাঁর নিজ প্রভুর পক্ষ থেকে দলিল- প্রমাণ উপস্থাপন ও প্রচার করেছিলেন যা ছিল বান্দাদেরকে পাপের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের সকল অজুহাত ও ওজর- আপত্তি অপনোদনকারী। তিনি তাঁর উম্মাতকে সতর্ককারী হিসেবে সদুপদেশ দিয়েছিলেন এবং সুসংবাদদাতা হিসেবে তাদেরকে বেহেশতের দিকে আহবান করেছিলেন। আর ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে তাদেরকে নরকাগ্নির ভীতি প্রদর্শন করেছিলেন।

# আহলে বাইত সম্পর্কে

আমরা (মহানবীর আহলে বাইত) নবুওয়াতের পবিত্র বৃক্ষ ঐশী বাণী অর্থাৎ রিসালতের অবস্থান-স্থল, ফেরেশতাদের অবতরণ ও আগমনস্থল, জ্ঞানের খনি এবং প্রজ্ঞার প্রস্রবণ ও উৎসস্থল। আমাদের সাহায্যকারী ও প্রেমিক মহান আল্লাহর রহমত ও দয়ার প্রত্যাশা করবে এবং আমাদের শত্রু ও আমাদের প্রতি ঘৃণা পোষণকারী মহান আল্লাহর তীব্র রোষে নিপতিত ও অভিশপ্ত হবে।

**খুতবা ১১০ থেকে**

তোমাদের নবীর হেদায়েতের মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য কর ও হেদায়েত প্রাপ্ত হও। কারণ তাঁর হেদায়েতই সর্বোত্তম হেদায়েত; আর তোমরা সবাই তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ করবে। কারণ তাঁর সুন্নাহ্ই সুন্নাহসমূহের মধ্যে সবচেয়ে সঠিক ও সুপথপ্রাপ্ত।

**খুতবা ১১৪**

আর (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি) হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। খুতবা ১১৬ থেকে তিনি (মহান আল্লাহ) তাঁকে সত্যের দিকে আহবানকারী এবং সমগ্র মানব জাতির উপর সাক্ষীস্বরূপ প্রেরণ করেছিলেন। অতঃপর তিনি নিরলসভাবে স্বীয় প্রভুর বাণীসমূহ (রিসালত) প্রচার করেছেন এবং এক্ষেত্রে তিনি কোন অবহেলা ও সামান্যতম দুর্বলতাও প্রদর্শন করেন নি। তিনি মহান আল্লাহর পথে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে সামান্যতম দুর্বলতা প্রদর্শন, ঠুনকো যুক্তি ও খোঁড়া অজুহাত পেশ না করেই বরং দৃঢ়তার সাথে জিহাদ করেছেন। তিনি খোদাভীরুদের নেতা এবং যারা সুপথ প্রাপ্ত হয়েছে তাঁদের চোখের দ্যুতি।

**খুতবা ১২২ থেকে**

আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর সাথে ছিলাম তখন (ইসলামের জন্যই) পিতা, পুত্র, ভ্রাতা ও নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হত। অতএব, যত বিপদাপদ ও দুঃখ- কষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, আমাদের ঈমান, সত্যের উপর অবিচল থাকা, ( মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের) নির্দেশ অর্থাৎ নির্ধারিত ফায়সালা ও সিদ্ধান্তের প্রতি আত্মসমর্পণ এবং আঘাত ও ক্ষতের অবর্ণনীয় দুঃখ- কষ্টে আমাদের ধৈর্যাবলম্বনও তত বৃদ্ধি পেয়েছে।

**খুতবা ১২৫ থেকে**

আর মহান আল্লাহ বলেছেন : অতঃপর যদি তোমরা কোন বিষয়ে পরস্পর দ্বন্দ্ব ও বিবাদে লিপ্ত হও তাহলে তা (তোমরা যে বিষয়ে দ্বন্দ্বে ও বিবাদে লিপ্ত হয়েছ সেই বিষয়টি) মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যর্পণ কর। অতএব, মহান আল্লাহর দিকে কোন বিষয়ে প্রত্যর্পণ করার অর্থ হচ্ছে যে আমরা ঐ ব্যাপারে মহান আল্লাহর কিতাব (আল- কোরআন) অনুযায়ী ফয়সালা করব এবং রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর দিকে তা (ঐ বিতর্কিত বিষয়টি) প্রত্যার্পন করার অর্থ হচ্ছে যে আমরা ঐ ব্যাপারে তাঁর সুন্নাহেক দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরব। আর যখন মহান আল্লাহর গ্রন্থের ভিত্তিতে নিষ্ঠা ও সততার সাথে ফয়সালা করা হবে তখন আমরাই (মহানবীর আহলুল বাইত) সকল জনগণের চেয়ে পবিত্র কোরআনের নিকটবর্তী ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হব। আর যখন রাসূলুল্লাহর সুন্নাহর ভিত্তিতে ফয়সালা করা হবে তখন আমরাই অন্য সকলের চেয়ে মহানবীর সুন্নাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং এ ব্যাপারে সবচেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হব।

**খুতবা ১৩২ থেকে**

আর আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর একান্ত মনোনীত ও প্রেরিত (নবী)। আর আমাদের এ সাক্ষ্য এমনই এক সাক্ষ্য যেখানে (আমাদের মাঝে) বিদ্যমান গোপন রহস্য আমাদের প্রকাশ্য ঘোষণার সাথে এবং (আমাদের)

অন্তর (আমাদের) কণ্ঠের সাথে পূর্ণরূপে খাপ খায় (যার ফলে আমাদের অন্তর ও মুখ নিসৃত ভাষা ও স্বীকারোক্তির মধ্যে কোন পার্থক্যই বিদ্যমান থাকে না)।

**খুতবা ১৩৩**

মহান আল্লাহ রাসূলদের বিদায় এবং জাতিসমূহের মধ্যকার মতবিরোধ ও দ্বন্দ্বের বেশ কিছু কাল পরে তাঁকে (মুহাম্মদ) প্রেরণ করেছিলেন। তিনি (মহান আল্লাহ) তাঁর (মুহাম্মদ) মাধ্যমে পূর্ববর্তী নবী- রাসূলদের ধারা এবং ওহী- ঐশী প্রত্যাদেশের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং তাঁর সাথে শিরক করেছিল তাদের বিরুদ্ধে তিনি জিহাদ করেছিলেন।

## হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে প্রেরণের উদ্দেশ্য

**খুতবা ১৪৭ থেকে**

মহান আল্লাহ বান্দাদেরকে মূর্তি পূজার কবল থেকে বের করে তাঁর ইবাদতের দিকে এবং শয়তানের আনুগত্য থেকে তাঁর আনুগত্যের দিকে আনয়ন করার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে (মানব জাতির কাছে) প্রেরণ করেছিলেন যাতে করে বান্দারা তাদের মহান প্রভু আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার পর তাঁকে সঠিকভাবে চিনতে পারে, তাঁকে অস্বীকার করার পর যাতে করে তাঁকে স্বীকার করে নেয় এবং তাঁর প্রতি অবিশ্বাস করার পর স্পষ্ট দলিল দ্বারা তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে, সেজন্য তিনি (আল্লাহ) পবিত্র কোরআন দ্বারা নিজ বান্দার কাছে নিজেকে পরিচিত ও তাঁর নিজ অস্তিত্বকে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তাই বান্দারা তাঁকে (মহান আল্লাহকে) চর্মচক্ষু দিয়ে না দেখেও তাদেরকে তাঁর অসীম শক্তির নমুনা দেখানো এবং তাঁর ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করার মাধ্যমে মহান আল্লাহ ঐশী গ্রন্থ আল- কোরআনে প্রকাশিত হয়েছেন (মহান আল্লাহকে বাহ্যিক চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা সম্ভব নয়, বরং তাঁকে তাঁর প্রকাশিত নিদর্শন দ্বারাই অনুধাবন করতে হবে)। আর এ গ্রন্থটিতে মহান আল্লাহ স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন যে, তিনি কিভাবে শাস্তি দানের মাধ্যমে এক দলকে ধ্বংস করেছেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে আরেক দলকে ছিন্নভিন্ন (মূলোৎপাটন) করেছেন।

**খুতবা ১৪৯ থেকে**

তবে আমার অসিয়ত : তোমরা অবশ্যই আল্লাহর সাথে কোন কিছুই শরীক করবে না এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর পবিত্র সুন্নাহ্ ধ্বংস করবে না। তোমরা অবশ্যই এ দু'টি স্তম্ভকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখবে এবং এ দু'টি প্রদীপকে অবশ্যই প্রজ্বলিত রাখবে।

**খুতবা ১৫০**

অনন্তর যখন মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করলেন তখন একদল লোক তাদের পূর্বেকার (পেছনের) জীবনে (জাহেলিয়াতের দিকে) প্রত্যাবর্তন করল, তারা (বিচ্যুত) পথ ও মতসমূহের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে গেল। তারা প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে গেল (রাসূলের আহলুল বাইতকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে) অনাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করল। তারা যাদেরকে (মহানবীর আহলুল বাইত) মুহব্বত করার ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছিল তাদেরকে বর্জন করল। তারা ইমারতকে সুদৃঢ় ভিত্তি ও সঠিক অবস্থান থেকে সরিয়ে নিয়ে অন্য (অনুপযুক্ত) স্থানে
স্থাপন করল। তারা সকল পাপ ও ভুল- ভ্রান্তির উৎসমূল এবং প্রচণ্ড আক্রমণকারীদের প্রবেশ দ্বার। তারা অস্থিরতা ও উত্তেজনার মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। মৃত্যু যন্ত্রণায় তাদের জ্ঞান- বুদ্ধি লোপ পেয়েছে ও তারা ধ্বংস হয়েছে। তারা ফেরাউন বংশের প্রথা ও রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তারা (আখেরাতের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে) কেবলমাত্র দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ও এর ওপর নির্ভরশীল অথবা সত্য ধর্ম (ইসলাম) থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন।

**খুতবা ১৫১ থেকে**

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল, নির্বাচিত- মনোনীত এবং তাঁর প্রিয় বন্ধু। কেউ তাঁর যোগ্যতা ও গুণের নিকটবর্তী হতে পারবে না (অর্থাৎ যোগ্যতা ও গুণে তিনি অতুলনীয়) আর তাঁর শূন্যতাও (তাঁকে হারানোর ক্ষতিও) কখনো পূরণ করা সম্ভব নয়। তিমিরাচ্ছন্ন, পথভ্রষ্টতা, প্রাধান্য বিস্তারকারী অজ্ঞতা এবং ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর অত্যাচারে যখন সবাই লিপ্ত, ( দিশেহারা) মানব জাতি যখন নিষিদ্ধ বিষয়কে হালাল মনে করত এবং জ্ঞানী- প্রজ্ঞাবানদেরকে অবমাননা করত, অলসতা অর্থাৎ ধর্মহীনতাকে পছন্দ করত এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যবরণ করত ঠিক তখনই তাঁর দ্বারা সকল দেশ ও জনপদ আলোকিত হয়েছে (অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতি তাঁর দ্বারা হেদায়েত বা সৎ পথের সন্ধান পেয়েছে)।

**খুতবা ১৫৮ থেকে**

মহান আল্লাহ রাসূলদের বিদায়, জাতিসমূহের নিদ্রা ও অসচেতনতা এবং পূর্ববর্তী নবীদের দ্বারা স্পষ্ট বর্ণিত ধর্ম ও বিধি- বিধান বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার বেশ কিছুকাল পরে তাঁকে (সা.) [সমগ্র মানব জাতির কাছে] প্রেরণ করলেন। অতঃপর তিনি তাদের (মানব জাতির) কাছে আগমন করলেন যাতে করে তারা তাঁর সাথে যা আছে তা এবং সেই অনুসরণীয় আলো- যা হচ্ছে পবিত্র কোরআন তা সত্য বলে স্বীকার করে নেয়। অতএব, তোমরা যদি পবিত্র কোরআনকে কথা বলতে বলো তবে তা কখনোই কথা বলতে পারবে না (অর্থাৎ তা নির্বাক), তবে তোমাদেরকে এই কোরআন সম্পর্কে আমি তথ্য দিতে পারি। তোমরা জেনে রাখো, এতে রয়েছে ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত জ্ঞান, অতীতের বিবরণ (তথ্য), তোমাদের রোগের ঔষধ (নিরাময়) এবং তোমাদের জীবনের যাবতীয় বিষয়াদির বিধি- বিধান।

**খুতবা ১৬০ থেকে**

নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর মাঝে তোমার জন্য রয়েছে পর্যাপ্ত আদর্শ। আর তাঁর কাছেই তোমার জন্য দুনিয়া ও বস্তুবাদিতার নিন্দাবাদ, দোষ- ত্রুটি। লাঞ্ছনা, অমঙ্গল ও দুর্যোগের আধিক্য সংক্রান্ত দলিল। কারণ তাঁর থেকে দুনিয়ার যাবতীয় রূপ ও দিককে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং অন্যের (দুনিয়া পূজারী) পদতলে বিছিয়ে রাখা হয়েছিল। তিনি দুনিয়ার স্তন্য পান করা থেকে অব্যাহতি ও মুক্তি পেয়েছিলেন এবং এর যাবতীয় চাকচিক্য, জৌলুস ও আড়ম্বরতা থেকে বহু দূরে ছিলেন।

অতএব, তোমরা নবী (সা.)- কে অনুসরণ কর যিনি সবচেয়ে পূতপবিত্র। নিশ্চয় যারা (তাঁর) অনুসরণ করে তাদের জন্য তাঁর মধ্যে রয়েছে আদর্শ এবং আর যারা সান্ত্বনা সন্ধান করছে অর্থাৎ শোকগ্রস্ত তাদের জন্য রয়েছে সান্ত্বনা। মহান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে নবীর অনুসরণকারী, তাঁর সুন্নাহর পাবন্দ। তিনি দুনিয়াকে খুব কমই ব্যবহার করেছেন এবং এ থেকে খুব সামান্যই গ্রহণ করেছেন।

তিনি ছিলেন পৃথিবীবাসীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অভুক্ত এবং (তাদের মধ্যে সবচেয়ে) বেশী উপবাসকারী (অর্থাৎ তিনি নিজ উদরকে দুনিয়া দিয়ে অর্থাৎ দুনিয়ার রকমারি সুস্বাদু ব্যঞ্জন দিয়ে কখনো পূর্ণ করেননি, বরং তা শূন্য রাখতেন)। তাঁর কাছে দুনিয়াকে উপস্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু তিনি দুনিয়াকে প্রত্যাখ্যানই করেছিলেন (দুনিয়াকে গ্রহণ করতে সম্মত হননি)। তিনি যখন জানতে পারলেন মহান আল্লাহ কোন কিছুকে ঘৃণা করেন তখন তিনিও সেটিকে ঘৃণা করলেন, মহান আল্লাহ যার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন তিনিও সেটির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলেন। মহান আল্লাহ যা তুচ্ছ মনে করেন তিনিও সেটিকেই তুচ্ছ মনে করলেন। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা ঘৃণা করেন সেটির ভালোবাসাই যদি কেবল আমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকে, মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা তুচ্ছ মনে করেছেন আমাদের অন্তরে যদি কেবল এর সম্মান বিদ্যমান থাকে, তা হবে মহান আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং তাঁর বিধি- নিষেধের বিরুদ্ধাচারণের শামিল। মহানবী (সা.) মাটিতে বসে আহার করতেন, ক্রীতদাসের মত বসতেন। নিজ হাতে (তাঁর) চপ্পল সিলাই করতেন, নিজ হাতে কাপড়ে তালি দিতেন, জিন বা আসনবিহীন গাধার ওপর আরোহণ করতেন এবং (গাধার পিঠে যখন চড়তেন তখন) তিনি তাঁর পেছনে অন্য আরেকজন ব্যক্তিকেও বসাতেন। একবার তাঁর বাড়ীর দরজার ওপর এমন একটি পর্দা টাঙ্গানো হয়েছিল যার মধ্যে কিছু ছবি অংকিত ছিল। এ কারণে তিনি (তা দেখে) তাঁর একজন স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "হে অমুক, পর্দাটি আমার (চোখের সামনে) থেকে সরিয়ে ফেল। কারণ যখনই আমি ঐটির দিকে তাকাই তখনই দুনিয়া ও এর চাকচিক্যের কথা আমার স্মরণ হয়। সুতরাং তিনি অন্তর দিয়েই দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন এবং তাঁর মন থেকে এর স্মরণকে (সম্পূর্ণরূপে) মিটিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি পছন্দ করতেন এবং ভালোবাসতেন যে, তাঁর চোখের সামনে থেকে দুনিয়ার সব সৌন্দর্য, চাকচিক্য দূর হয়ে যাক যাতে করে তাঁকে দুনিয়া থেকে গর্বের কোন পোশাক যেন পরিধান, একে (এ দুনিয়াকে) যেন তাঁর আবাসস্থল বলে বিবেচনা এবং এ জগতে যেন কোন পদমর্যাদার আশা করতে না হয়। তাই তিনি মন ও হৃদয় থেকে দুনিয়াকে বের করে দিয়েছিলেন এবং দৃষ্টি শক্তির সীমা থেকে দূর করেছিলেন। আর ঠিক

একইভাবে যে ব্যক্তি কোন জিনিসকে অপছন্দ ও ঘৃণা করে আসলে সে ঐ জিনিসটির প্রতি দৃষ্টি দিতে (তাকাতে) এবং ঐ জিনিসটির আলোচনা ও স্মরণ করতেও ঘৃণাবোধ করে।

মহানবী (সা.)- এর মধ্যে এমন কিছু আছে যা দুনিয়ার যাবতীয় অনিষ্ট, দুর্যোগ- দুর্গতি এবং দোষ- ত্রুটি পরিষ্কার করে দেবে। মহান আল্লাহর কাছে তাঁর বিশেষ ফযীলত ও মর্যাদা (থাকা) সত্ত্বেও তিনি এ দুনিয়ায় অনাহারে কাটিয়েছেন। মহান আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী বান্দা হয়েও তাঁর থেকে দুনিয়ার চাকচিক্য ও মিথ্যা শান- শওকত দূর করা হয়েছে। অতএব, চিন্তাশীল পর্যবেক্ষণকারীর উচিত যেন সে তার বিবেক- বুদ্ধি দিয়েই পর্যবেক্ষণ করে এবং ভেবে দেখে, মহান আল্লাহ কি তাহলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে সম্মানিত করেছেন, না অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করেছেন? যদি সে বলে, আল্লাহ তাঁকে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করেছেন, তাহলে সে মিথ্যাই বলল। মহান আল্লাহর শপথ! এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় ও জঘন্য অপবাদ। আর যদি সে বলে, মহান আল্লাহ তাঁকে সম্মানিত করেছেন, তাহলে তার জানা উচিত, অন্যদের কাছে এ পৃথিবীকে প্রসারিত করে আসলে মহান আল্লাহ তাদেরকেই অপদস্ত ও লাঞ্ছিত করেছেন। তিনি এ দুনিয়াকে তাঁর সবচেয়ে নিকটবর্তী বান্দার কাছ থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন। অতএব, অনুসরণকারীর উচিত মহান আল্লাহর নবীর অনুসরণ করা, তাঁর সুন্নাহ্ ও আদর্শ মেনে চলা অর্থাৎ যেখানে তিনি প্রবেশ করেছেন সেখানে প্রবেশ করা। আর যদি এমন না হয় তাহলে সে ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাবে না। কারণ মহান আল্লাহ তাঁকে কিয়ামতের নিদর্শন, ( তাঁর নবুওয়াতই হচ্ছে কিয়ামত অত্যাসন্ন হওয়ার দলিল।

কারণ তাঁর পরে আর কোন নবী নেই), জান্নাতের সুসংবাদদাতা, ( জাহান্নামের) শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারীস্বরূপ নিযুক্ত ও প্রেরণ করেছেন। তিনি এ পৃথিবী থেকে অভুক্তাবস্থায় বিদায় নিয়েছেন (দুনিয়ার ভোগ- বিলাস কখনোই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি)। সম্পূর্ণ সুস্থভাবে ও নিরাপদে আখেরাতে (পরলোকে) গমন করেছেন। তিনি পাথরের ওপর পাথরও স্থাপন করেন নি (সুরম্য প্রাসাদ ও অট্টালিকাও নির্মাণ করেন নি)। আর পরিশেষে এ অবস্থায়ই তিনি তাঁর পথ অতিক্রম করেছেন এবং প্রভুর পক্ষ থেকে আহবানকারীর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন। আমাদের ওপর মহান

আল্লাহর দয়া- করুণা যে কত বড় ও অপরিসীম তার প্রমাণ হচ্ছে, তিনি তাঁকে (হযরত মুহাম্মদকে)আমাদের অনুসরণীয় ও নেতা করেছেন যাকে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও পদে পদে অনুসরণ করছি। মহান আল্লাহর শপথ, আমি আমার এই পশমী বস্ত্রটির ওপর এতটা তালি লাগিয়েছি যে, তা তার ওপর তালিদাতাকে দেখে লজ্জাই পাচ্ছে। এক ব্যক্তি যখন আমাকে (এ ব্যাপারে)বলেছিল, "আপনি কি ওটাকে (তালি দেয়া পশমী কাপড়টি) আপনার কাছ থেকে দূর করবেন না?" তখন আমি তাকে বলেছিলাম, "আমা থেকে দূর হও! কারণ প্রভাত বেলায় সম্প্রদায় (কওম) রাত জেগে পথ চলাকে প্রশংসা করে (অর্থাৎ সম্প্রদায় এখানে যারা রাত ঘুমিয়ে কাটিয়েছে এবং যাত্রা বিরতি করেছে অর্থাৎ পথ চলেনি তারা ঘুম থেকে জেগে যখন দেখতে পায় রাতে যারা পথ চলেছে তারা তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে, তখন তারা রাতে না ঘুমিয়ে পথ চলাকে প্রশংসা করে এবং রাত ঘুমিয়ে কাটানোর জন্য তারা তদের নিজেদের ব্যাপারেই পরিতাপ করতে থাকে)।

**খুতবা ১৬১ থেকে**

মহান আল্লাহ তাঁকে আলো দানকারী দ্যুতি (নূর), স্পষ্ট দলিল- প্রমাণ, প্রকাশ্য কর্ম- পদ্ধতি (শরীয়ত) ও পথ প্রদর্শনকারী গ্রন্থ (পবিত্র কোরআন)সহ প্রেরণ করেছেন। তাঁর পরিবার শ্রেষ্ঠ পরিবার এবং তাঁর বংশধারা শ্রেষ্ঠ বংশধারা, যার ডাল- পালা ভারসাম্যপূর্ণ এবং ফলগুলো ঝুঁকে পড়েছে (তোলা বা চয়ন করার উপযুক্ত হয়েছে)। তাঁর জন্মস্থান পবিত্র মক্কা নগরী এবং তাঁর হিজরতস্থল তাইবাহ্ (পবিত্র মদীনা নগরী)। এর (মদীনার) দ্বারাই তাঁর স্মরণ সুউচ্চ ও সম্মানিত হয়েছে এবং সেখান থেকেই তাঁর কণ্ঠ (তাঁর বাণী- কথা) সর্বত্র প্রচারিত হয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁকে যথেষ্ট দলিল- প্রমাণ, স্পষ্ট উপদেশ ও সংস্কারধর্মী দাওয়াত অর্থাৎ আহবানসহ প্রেরণ করেছেন। মহান আল্লাহ তাঁর দ্বারা অজ্ঞাত- অজানা ধর্ম ও শরিয়ত প্রকাশিত করেছেন এবং মানব জাতির মধ্যে প্রবিষ্ট বিদআত বা ধর্মবহির্ভূত প্রথা দূর করেছেন। আর তাঁর দ্বারা মহান আল্লাহ বিস্তারিত বিধি- বিধানসমূহও বর্ণনা করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মকে বাদ দিয়ে

অন্য কোন ধর্মের অনুসারী হবে তার দুরবস্থা ও দুর্ভাগ্য স্পষ্ট প্রতিভাত হবে এবং তার রজ্জু ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। আর তার পতন, স্খলনও বড় হবে। তখন তার প্রত্যাবর্তনস্থল হবে স্থায়ী (দীর্ঘ) দুঃখ ও কঠোর শাস্তি।

**খুতবা ১৬২ থেকে**

আমরাই (মহানবীর আহলুল বাইত) বংশ মর্যাদা ও কৌলিন্যের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং রাসূলুল্লাহর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং তাঁর সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

**খুতবা ১৬৯**

মহান আল্লাহ একটি সবাক ঐশীগ্রন্থ (আল- কোরআন) ও একটি সুপ্রতিষ্ঠিত বিষয় (ইসলাম ধর্ম ও শরীয়ত) সহকারে একজন হেদায়েতকারী (পথ- প্রদর্শক) রাসূলকে (হযরত মুহাম্মদ) প্রেরণ করেছেন। একমাত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত কেউ তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না (যার স্বভাব- চরিত্রের মাঝে বক্রতা ও বিচ্যুতি বিদ্যমান কেবল সেই তাঁর হেদায়েত থেকে মুখ ফিরিয়ে ধ্বংস হয় এবং চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্য ও ধ্বংসের অতল গহবরে চিরতরে তলিয়ে যায়)। সত্য ধর্ম ইসলামের সাথে সদৃশ নবোদ্ভাবিত বিষয়াদি (বিদআতসমূহ যা রাসূলুল্লাহর যুগে ছিল না বরং তাঁর পরে প্রচলিত হয়েছে) প্রকৃতপক্ষে ধ্বংসকারী (এসব বিদআতপন্থীদেরকে সমূলে ধ্বংস করে) তবে মহান আল্লাহ এগুলো (এসব বিদআত) থেকে যা রক্ষা করেছেন তা ব্যতীত। আর মহান আল্লাহর পরাক্রমশালী কর্তৃত্বে রয়েছে তোমাদের দীন ও রাষ্ট্রশক্তির অভ্রান্ততা, অকাট্যতা এবং স্থায়িত্ব। অতএব, কপটতা পরিহার করে স্বেচ্ছায় বিশুদ্ধ চিত্তে একমাত্র তাঁকেই তোমাদের সমুদয় আনুগত্য প্রদান কর (অর্থাৎ মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে আনুগত্য প্রকাশ কর)। মহান আল্লাহর শপথ, হয় তোমরা সবাই এ কাজটি অবশ্যই আঞ্জাম দেবে নতুবা মহান আল্লাহ ইসলামের রাষ্ট্রশক্তি তোমাদের কাছ থেকে অবশ্যই কেড়ে নেবেন। অতঃপর তোমাদের থেকে

ভিন্ন ব্যক্তিদের কাছে তা প্রত্যাবর্তন করা পর্যন্ত তিনি তা তোমাদের কাছে আর কখনো ফিরিয়ে দেবেন না।

**খুতবা ১৭৩ থেকে**

( হযরত মুহাম্মদ) তাঁর (আল্লাহর) ঐশী প্রত্যাদেশের বিশ্বস্ত আমানতদার, তাঁর সর্বশেষ রাসূল। তাঁর দয়া ও করুণার সুসংবাদদাতা এবং তাঁর শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী।

**খুতবা ১৭৮ থেকে**

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর (মহান আল্লাহর) বান্দা, তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্য থেকে তাঁর মনোনীত রাসূল, তাঁর নিগূঢ় বাস্তব তাৎপর্য ও সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করার জন্য নির্বাচিত। তাঁর (মহান আল্লাহর) সুমহান (উত্তম) অলৌকিক বিষয়াদি অর্থাৎ মু'জেযাসমূহের জন্য তিনি বিশেষভাবে নির্ধারিত (অর্থাৎ তিনি মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত মহান আলৌকিক বিষয়াদি অর্থাৎ মু'জেযাসমূহেরও অধিকারী ছিলেন)। তিনি তাঁর (মহান আল্লাহর) রিসালতের সকল উৎকৃষ্ট গুণ ও বৈশিষ্ট্যের জন্য একান্তভাবে মনোনীত ও নির্বাচিত। তাঁর দ্বারা হেদায়েতের সকল চিহ্ন ও নিদর্শন স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে এবং অন্ধত্বের (জাহেলীয়াত) গাঢ় কালো আঁধারও তাঁর দ্বারা দূরীভূত হয়েছে।

**খুতবা ১৮৫ থেকে**

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও তাঁর একান্ত মনোনীত (নির্বাচিত) রাসূল। তিনি মহান আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁর বিশ্বস্ত আমানতদার। মহান আল্লাহ তাঁর ও তাঁর বংশধরদের ওপর অশেষ দরুদ ও সালাত প্রেরণ করুন। তিনি তাঁকে অত্যাবশ্যকীয় দলিল-প্রমাণ, প্রকাশ্য বিজয় (সত্য ধর্মের বিজয়) এবং সুস্পষ্ট পথ ও পদ্ধতিসহ প্রেরণ করেছিলেন। তাই তিনি প্রকাশ্যে ও সত্য ঘোষণা দিয়ে আল্লাহর রিসালাত (অর্থাৎ সত্য ধর্ম ইসলাম) প্রচার

করেছেন। তিনি মানব জাতিকে সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেছেন সৎ পথের সন্ধান দিয়েছেন। তিনি হেদায়েতের চিহ্ন ও নিদর্শন এবং আলোর মিনার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি ইসলামের রজ্জুকে শক্তিশালী ও ঈমানের গ্রন্থিসমূহকে সুদৃঢ় করেছেন।

**খুতবা ১৯০ থেকে**

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি মানব জাতিকে মহান আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আহবান করেছিলেন। তিনি ধর্মের জন্য জিহাদ করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর শত্রুদেরকে দমন করেছিলেন। তাঁকে প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করার ক্ষেত্রে (সকল কাফের- মুশরিকদের) ঐকমত্য এবং তাঁর প্রচারিত দীনের আলো নির্বাপিত করার যাবতীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টা তাঁকে (তাঁর সুমহান আদর্শ ও দায়িত্ব- কর্তব্য থেকে) বিরত রাখতে পারেনি।

**খুতবা ১৯১ থেকে**

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। মানব জাতি যখন তীব্র ফেতনা ও ভয়ঙ্কর বিপদাপদে (আকণ্ঠ) নিমজ্জিত ছিল এবং জটিলতা ও বুদ্ধিহীনতার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল, যখন তাদেরকে মৃত্যুর লাগামসমূহ আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিল এবং পথভ্রষ্টতার পর্দা যখন তাদের অন্তঃকরণসমূহকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ঠিক সেই সময় মহান আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন।

**খুতবা ১৯২ থেকে**

তাদের ওপর প্রদত্ত মহান আল্লাহর নেয়ামতসমূহের ক্ষেত্রগুলোর দিকে তোমরা সবাই লক্ষ্য কর, যখন তিনি তাদের কাছে একজন রাসূল প্রেরণ করলেন যিনি তাঁর ধর্মের সাথে তাদের আনুগত্যকে জুড়ে দিলেন এবং তাঁর নিজ আহ্বানের ওপর তাদের বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য- সম্প্রীতিকে সন্নিবেশিত করলেন। তোমরা সবাই লক্ষ্য কর, তাদের ওপর মহান আল্লাহর নেয়ামতসমূহ

কিভাবে দয়া ও মহত্ত্বের ডানা বিস্তৃত করেছিল এবং কিভাবে তাদেরকে মহান আল্লাহর নেয়ামতসমূহের বান ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে আগত কল্যাণ ও বরকতে তাদের দ্বারা একটি আদর্শিক জাতিসত্তা ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছিল। তাই তারা খোদা প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের মাঝে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ও সজীব, প্রাণবন্ত জীবন- ধারায় পূর্ণ তুষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এক শক্তিশালী শাসকের ছত্রছায়ায় তাদের সকল বিষয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রবল সম্মান ও মর্যাদার ক্রোড়ে তারা আশ্রয় লাভ করেছিল। আর স্থায়ী রাজ্যশক্তির শীর্ষে তাদের অবস্থানের কারণেই তাদের দিকে সকল বিষয় ঝুঁকে গিয়েছিল।

অতএব, তারাই জগৎসমূহের ওপর শাসনকর্তা এবং সমগ্র বিশ্বের অধিপতি। যারা তাদের মাঝে বিধি- বিধানসমূহ বলবৎ ও কার্যকরী করত (অর্থাৎ শাসন করত) এখন তারাই তাদের ওপর বিধি- বিধানসমূহ বলবৎ ও কার্যকরী করছে। তাদের জন্য বর্শা আর পরীক্ষিত করা হয় না এবং তাদের জন্য কোন শক্ত কঠিন পাথরও ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করা হয় না। যাতে তিনি সকল ভুল- ভ্রান্তি থেকে মুক্ত ও পবিত্র থাকেন সেজন্য মহান আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ফেরেশতাকে তাঁর নিত্য সঙ্গী করে দিয়েছিলেন। ঐ ফেরেশতা তাঁকে দিবা- রাত্র শিষ্টাচার শিক্ষা দিতেন এবং জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীর দিকে পরিচালিত করতেন। উষ্ট্র শাবক যেমনভাবে উষ্ট্রীকে অনুসরণ করে ঠিক সেভাবে আমি তাঁকে অনুসরণ করতাম। তিনি প্রতিদিন তাঁর উন্নত চরিত্র থেকে একটি নিদর্শন আমাকে শিক্ষা দিতেন এবং আমাকে তা পালন করার নির্দেশ দিতেন।...

তাঁর ওপর যখন ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল তখন আমি শয়তানের ক্রন্দন ধ্বনি শুনেছিলাম। তাই আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ''হে রাসূলুল্লাহ! এ ক্রন্দন ধ্বনি কার?'' তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন, ''এই শয়তান এখন থেকে তার পূজা (ইবাদত) করা হবে না বলে হতাশ ও নিরাশ হয়ে গেছে। নিশ্চয় তুমি আমি যা শুনি তা শুন এবং আমি যা দেখি তা দেখ। তবে তুমি নবী নও, কিন্তু [নবীর] সহকারী এবং নিঃসন্দেহে তুমি মঙ্গল ও কল্যাণের ওপরই আছ।

আমি ঐ সময় তাঁর সাথে ছিলাম যখন কুরাইশদের নেতৃবর্গ তাঁর কাছে এসে বলল, ''হে মুহাম্মদ! তুমি এমন এক বিষয় দাবী করছ যা তোমার কোন পূর্বপুরুষ এবং তোমার বংশের কোন

ব্যক্তি ইতোপূর্বে দাবী করে নি। এখন আমরা তোমার কাছে এমন একটি বিষয়ে প্রশ্ন করব যদি তুমি তার সঠিক জবাব দিতে পার এবং তা আমাদেরকে প্রদর্শন কর তাহলে আমরা নিশ্চিত হব যে, তুমি সত্য নবী ও রাসূল। আর যদি তুমি তা করতে না পার তাহলে আমরা নিশ্চিত হব, তুমি ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী ও যাদুকর। তখন মহানবী তাদেরকে বললেন, ''তোমরা কি জিজ্ঞেস করতে

চাও?" তখন তারা বলল, ''তুমি এ বৃক্ষটিকে আহবান কর যাতে এটি তার মূলসমেত তার স্থান থেকে উঠে এসে তোমার সন্মুখে দণ্ডায়মান হয়।" তখন মহানবী (সা.) বললেন, ''মহান আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। অতএব, মহান আল্লাহ যদি তা তোমাদের জন্য আঞ্জাম দেন তাহলে তখন কি তোমরা বিশ্বাস করবে এবং সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করবে?" তারা বলল, ''হ্যাঁ।" তখন মহানবী বললেন, ''তাহলে তোমরা যা আমার কাছে দাবী করছ তা আমি তোমাদেরকে দেখাব। তবে আমি ভালোভাবে অবগত আছি, তোমরা কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না। কারণ তোমাদের মধ্যে কুয়ায় নিক্ষিপ্ত হয় এমন ব্যক্তি এবং দলসমূহকে একত্র ও ঐক্যবদ্ধ করে এমন ব্যক্তিও আছে।'' এরপর মহানবী (উক্ত গাছটিকে লক্ষ্য করে) বললেন, ''হে বৃক্ষ! যদি তুমি মহান আল্লাহ ও শেষ বিচার দিবসে বিশ্বাসী হয়ে থাক এবং জেনে থাকো, আমি আল্লাহর রাসূল তাহলে মহান আল্লাহর অনুমতি নিয়ে শিকড় ও মূলসহ তোমার স্থান থেকে উঠে এসো এবং আমার সামনে দাঁড়িয়ে যাও।'' যে সত্তা তাঁকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন ঐ বৃক্ষটি তাই করল, মূলসমেত (উঠে এসে মহানবীর সামনে) দণ্ডায়মান হল এবং তখন তা তীব্র গর্জন করছিল এবং পাখীর ডানার যেরূপ শব্দ হয় সেরূপ শব্দ করছিল। বৃক্ষটি উড়ে এসে মহানবীর সামনে এসে দাঁড়াল এবং সবচেয়ে উঁচু ডালটি মহানবীকে স্পর্শ করল আর তার কতিপয় শাখা দিয়ে আমার কাঁধও স্পর্শ করল। আমি তখন রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর ডান পাশে ছিলাম। ঐ দলটি যখন এ মুজেযাটি প্রত্যক্ষ করল তখন গর্ব ও দম্ভ করে বলল, ''হে মুহাম্মদ! এ গাছটিকে আদেশ দাও তো ওটির অর্ধাংশ স্বস্থানে থেকে যাবে এবং বাকী অর্ধাংশ তোমার কাছে চলে আসবে।'' অতঃপর রাসূল গাছটিকে তা করার আদেশ দিলেন। নির্দেশ শুনে গাছটি অত্যন্ত

আশ্চর্যজনকভাবে তীব্র গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসল। তা প্রায় মহানবীর চারপাশ ঘিরে ধরল। (এ দৃশ্য দেখে) তারা কুফরী ও ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে বলল, ''এ অর্ধাংশটিকে পূর্বে যেমন ছিল তেমনি ঐ বৃক্ষটির বাকী অর্ধাংশের কাছে ফিরে যাবার নির্দেশ দাও।" অতঃপর মহানবী (সা.) নির্দেশ দিলে তা বাকী অর্ধাংশের কাছে ফিরে গেল। তখন আমি বললাম, ''আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই; হে রাসূলুল্লাহ! আমি আপনার প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী। আমি প্রথম স্বীকারোক্তিকারী যে গাছটি মহান আল্লাহর নির্দেশে আপনার নবুওয়াতের সত্যায়নকারী এবং আপনার কথার প্রতি সম্মান প্রদর্শনস্বরূপ যা করার দরকার ছিল তা- ই করেছে।'' এরপর ঐ সব কাফির- মুশরিক বলল, ''( হে মুহাম্মদ!) তুমি ভয়ঙ্কর মিথ্যাবাদী, যাদুকর। আজব ধরনের যাদুকরী ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী তুমি যে, ( দর্শকদের জ্ঞান- বুদ্ধি) একেবারে লোপ পেয়ে যায়। তোমার ব্যাপারে এ ধরনের ব্যক্তি (তারা আমাকেই বুঝাতে চেয়েছে) কি তোমার সত্যায়নকারী? আর আমি (আলী) এমন এক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে নিন্দুকের নিন্দা যাদের ওপর বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলে না, যাদের বদনমণ্ডল সিদ্দীক অর্থাৎ পরম সত্যবাদীদের বদনমণ্ডল। যাদের কথা পুণ্যবানদের কথা, যারা রাত্রি জাগরণকারী (রাত জেগে মহান আল্লাহর ইবাদত- বন্দেগী ও ধ্যান করে) ও দিনের আলোকবর্তিকা, যারা পবিত্র কোরআনের রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণকারী, যারা মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ্ পুনরুজ্জীবিত করে, যারা গর্ব ও অহংকার করে না ও নিজেদেরকে বড় মনে করে না,
বিশ্বাসঘাতকতা করে না এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে না, যাদের অন্তঃকরণসমূহ বেহেশতে এবং দেহসমূহ এ পার্থিবজগতে কর্মে নিয়োজিত আছে।

**খুতবা ১৯৪ থেকে**

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সর্বোচ্চ পরিমাণ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেও নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এজন্য তিনি শ্বাসরোধকারী কণ্টক ও গলাধঃকরণ করেছিলেন (অর্থাৎ তাঁকে এজন্য অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করতে

হয়েছে)। তাঁর নিকটাত্মীয়গণ (বনু হাশিম) পক্ষাবলম্বন করেছিল। আর দূরবর্তিগণ (অনাত্মীয়গণ)তাঁর বিরুদ্ধে একত্র হয়েছিল। আরব জাতি তাদের বিরুদ্ধে অশ্বসমূহের লাগাম ঢিলা ও অবনত করেছিল এবং তারা নিজেদের বাহক পশুসমূহের পেটে আঘাত করে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। ফলে (আরবের) প্রত্যন্ত এলাকা ও দূর- দূরান্ত থেকে শত্রুগণ তাঁর দোরগোড়ায় তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উপস্থিত হয়েছিল।

**খুতবা ১৯৫ থেকে**

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। যখন হেদায়েত অর্থাৎ সুপথপ্রাপ্তির নিদর্শনাদি ধ্বংস ও ধর্মের সমুদয় পথ বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তখন মহান আল্লাহ তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) [মিথ্যার সৌধকে ধূলিসাৎ করে] প্রকাশ্যে সত্যের ঘোষণা ও প্রচার করেছিলেন, মানব জাতিকে সদুপদেশ দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে সুপথে পরিচালিত করেছিলেন। তিনি প্রতিটি বিষয় ও ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহ তাঁর ও তাঁর পবিত্র আহলুল বাইতের ওপর দরুদ ও সালাম প্রেরণ করুন।

**খুতবা ১৯৬ থেকে**

মহান আল্লাহ তাঁকে এমন সময় প্রেরণ করেছিলেন যখন কোন নিদর্শন, (হেদায়েতের) আলোকবিচ্ছুরণকারী কোন আলোকবর্তিকা, কোন সুস্পষ্ট পথ ও পদ্ধতি (অর্থাৎ কোন কিছুই) বিদ্যমান ছিল না।

**খুতবা ১৯৮ থেকে**

অতঃপর মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে ঐ সময় সত্যসহ প্রেরণ করলেন যখন এ পৃথিবীর ধ্বংস অত্যাসন্ন হয়ে পড়েছিল, যখন পরকালের আগমন (কিয়ামত) নিকটবর্তী হয়ে

গিয়েছিল; আলোকিত হবার পর সকল সৌন্দর্য ও শোভা নিকষ কালো আঁধারে পরিণত হয়েছিল এবং পৃথিবী তার নিজ অধিবাসীদের পদতলে দলিত ও পিষ্ট করছিল; পৃথিবীর উপরিভাগ রুক্ষ ও কঠিন হয়ে পড়েছিল (অর্থাৎ দুনিয়ার যন্ত্রণা তীব্র আকার ধারণ করেছিল) এবং তা ধ্বংসের নিকটবর্তী হয়ে পড়েছিল। আর এটি ছিল পৃথিবীর জীবনকাল শেষ হবার সময়, এর ধ্বংস হবার চিহ্ন ও নিদর্শনসমূহ নিকটবর্তী হবার সময়, পৃথিবীবাসীদের সমূলে উচ্ছেদ হবার সময়, এর জীবনসূত্র ছিন্ন হবার সময়, এর (পার্থিবজগতের) ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবার সময়, এর (পার্থিবজগৎ ও জীবনের) যাবতীয় চিহ্ন ও নিদর্শন বিলুপ্ত হবার সময়, এর যাবতীয় কুৎসিত দিক ও চেহারা প্রকাশিত হবার সময় এবং এর দীর্ঘ জীবনের সংক্ষিপ্ত হয়ে যাবার সময়। (এই মহাক্রান্তি কালে) মহান আল্লাহ তাঁকে (হযরত মুহাম্মদ) তাঁর রিসালত বা ঐশী বাণীর প্রচারক, তাঁর উম্মতের সম্মানের প্রতীক, তাঁর যুগের অধিবাসীদের বসন্ত, তাঁর সঙ্গী-সাথীদের গৌরব এবং তাঁর সাহায্যকারীদের মর্যাদার প্রতীক হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, হযরত মুহাম্মদ (সা.) মহান আল্লাহর একান্ত মনোনীত, তাঁর ঐশী বাণীর দূত ও তাঁর রহমতের রাসূল।

**খুতবা ১৯৯ থেকে**

(হে নবী) আপনি আপনার পরিবারবর্গকে নামায পড়ার আদেশ দিন এবং এর ওপর ধৈর্য সহকারে বহাল থাকুন মহান আল্লাহর এ বাণীর জন্য তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ ও নিশ্চয়তা দেয়ার পরও রাসূলুল্লাহ (সা.) এত অধিক নামায পড়তেন যে, তিনি ক্লান্ত হয়ে যেতেন।

খুতবা ২০২ থেকে

হযরত আলী (আ.) নবী দূহিতা হযরত ফাতেমা (আ.)- কে দাফন করার সময় বলেছিলেন :"হে রাসূলুল্লাহ্! আমার পক্ষ থেকে এবং আপনার কন্যার যিনি আপনার সান্নিধ্যে গমন করেছেন এবং আপনার সাথে মিলিত হয়েছেন তাঁর পক্ষ হতে আপনার ওপর সালাম। হে রাসূলাল্লাহ্! আপনার

সবচেয়ে প্রিয় কন্যার বিয়োগ ব্যথায় আমার ধৈর্য হ্রাস পেয়েছে, তাঁর শোকে আমার সহ্যশক্তি দুর্বল হয়েছে। তবে আপনার মহাপ্রয়াণ ও আপনাকে হারানোর বিরাট মুসিবতে যে আমি ধৈর্যধারণ করতে পেরেছি তাতেই রয়েছে আমার সান্ত্বনা। আমি আপনাকে কবরে শায়িত করেছিলাম। আর আমার গ্রীবা ও বক্ষদেশের মাঝখানে আপনার পবিত্র আত্মা দেহত্যাগ করেছিল। নিশ্চয় আমরা মহান আল্লাহর এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করব। (আমার কাছ থেকে) আমানত ফিরিয়ে নেয়া হলো এবং যা দেয়া হয়েছিল তা পুনরায় নিয়ে নেয়া হলো। আপনি যে ঘরে বসবাস করছেন সে ঘরের জন্য আমাকে মনোনীত করা পর্যন্ত আমার সকল দুঃখ ও শোক এখন স্থায়ী হয়ে গেল এবং রজনীগুলো নিদ্রাহীনতা ও জাগরণের মধ্যে দিয়েই অতিবাহিত হবে। আর অতি শীঘ্রই আপনাকে আপনার কন্যা আপনার উম্মত তাঁর ওপর যে অত্যাচার করেছে তা অবহিত করবেন। অতএব, আপনি তাঁকে বিস্তারিত সব কিছু জিজ্ঞেস করুন এবং তাঁর কাছ থেকে প্রকৃত অবস্থা জেনে নিন। এটি (আপনার প্রাণপ্রিয় কন্যাকে হারানো) এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটেছে যে, আপনার মৃত্যুর পর দীর্ঘকালও অতিবাহিত হয় নি এবং আপনার পুণ্য স্মৃতি এখনো বিদ্যমান। আপনাদের উভয়ের প্রতি আমার সালাম। এ সালাম একজন চিরবিদায় জ্ঞাপনকারীর, তবে এটি ঘৃণা প্রদর্শনকারী বা বিরক্ত কোন ব্যক্তির সালাম নয়। তাই, আমি যদি (এ স্থান থেকে)চলে যাই তা এজন্য নয় যে, আমি অস্থির ও ক্লান্ত হয়ে গেছি। আর আমি যদি (এখানে চিরস্থায়ীভাবে) থেকে যাই তাহলে তা এজন্য নয় যে, মহান আল্লাহ তাঁর ধৈর্যশীল বান্দাদের কাছে যে অঙ্গীকার করেছেন তাতে আমি কুধারণা পোষণ করি (অর্থাৎ আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়েছি)।

## খুতবা ২১০

রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর জীবদ্দশায়ও তাঁর ওপর মিথ্যারোপ করা হয়েছিল যদ্দরুন তিনি (সকলের উদ্দেশ্যে) ভাষণ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, ‘‘যে ব্যক্তি ইচ্ছা প্রণোদিত হয়ে আমার ওপর

মিথ্যারোপ করবে (অর্থাৎ আমার নামে মিথ্যা কথা বলবে) সে যেন জাহান্নামে তার বাসস্থান নির্ধারণ করে নেয়।''

**খুতবা ২১৩ থেকে**

তিনি (মহান আল্লাহ) তাঁকে (হেদায়েতের উজ্জ্বল) আলোসহ প্রেরণ করলেন এবং মনোনীত ও নির্ধারিত করার ক্ষেত্রে তাঁকেই অগ্রগামী করলেন (অর্থাৎ মহান আল্লাহ তাঁকে সকল মনোনীত ও নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করলেন)। তাঁর মাধ্যমে মহান আল্লাহ সকল ফাটল, চিড় ও বিভক্তি জোড়া দিলেন (অর্থাৎ মানব সমাজের যত দুর্নীতি, বিভেদ ও অনৈক্য বিরাজ- করছিল তা সংশোধন করে দিলেন।) এবং সত্যের উপর সকল প্রাধান্য বিস্তারকারীকে পরাভূত করলেন। তাঁর মাধ্যমে মহান আল্লাহ সকল দুঃখ- কষ্টকে সহজসাধ্য এবং অসমতল ভূমিকে সমতল করে দিলেন। আর এভাবে তিনি ডান- বাম সকল দিক থেকে পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহী দূর করলেন।

**খুতবা ২১৪ থেকে**

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, তিনি (মহান আল্লাহ) ন্যায়পরায়ণ যিনি ন্যায়পরাণতা অবলম্বন করেছেন এবং ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী যিনি সঠিক মীমাংসা করেছেন। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল, তাঁর বান্দাদের নেতা। যখনই মহান আল্লাহ মানব জাতিকে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে উত্তরণ করে দুই বংশধারায় বিভক্ত করেছেন তখনই তিনি তাঁকে সর্বোত্তম বংশধারায় স্থাপন করেছেন। তাই তাঁর পবিত্র বংশধারায় (পূর্বপুরুষদের মধ্যে) কোন লম্পট- ব্যভিচারী ছিল না বা কোন পাপাচারীও তার শরীক হয় নি।

**খুতবা ২৩১ থেকে**

হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছেন তা (সত্য ধর্ম) প্রকাশ্যে প্রচার করেছেন। তিনি স্বীয় প্রভুর ঐশী বাণী (মানব জাতির কাছে) পৌঁছে দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে বিভক্তি ও অনৈক্যের ফাটল জোড়া দিয়েছেন; তাঁকে দিয়ে বিচ্ছিন্নদেরকে (ঐক্যের) সূত্রে গ্রথিত করেছেন; তাঁর মাধ্যমে মহান আল্লাহ বক্ষসমূহে প্রবিষ্ট শত্রুতা ও অন্তরসমূহে প্রজ্জ্বলিত হিংসা-বিদ্বেষের কারণে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়দেরকে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

**খুতবা ২৩৫ থেকে**

মহানবী (সা.)- এর পবিত্র লাশ মোবারক গোসল দিয়ে কাফন পরানোর সময় হযরত আলী (আ.) বলেছিলেন, "আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গীকৃত হোক! আপনার মৃত্যুতে নবুওয়াত ও মহান নবীদের পবিত্র ধারা এবং আসমানের সংবাদসমূহ (ঐশী বাণীসমূহ) সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেল যা অন্য কোন নবীর মৃত্যুতে বন্ধ হয় নি। আমাদের (আহলে বাইত) কাছে আপনার মর্যাদা এতটা যে, আপনার শোক আমাদের কাছে সান্ত্বনার উৎস হয়ে গিয়েছে যা অন্যদের ক্ষেত্রে হয় নি। আপনার বিয়োগ- ব্যথা সর্বজনীন যে এক্ষেত্রে সকল মানুষই সমানভাবে অংশীদার। আর আপনি যদি ধৈর্যাবলম্বন করার আদেশ না দিতেন এবং অস্থির হতে বারণ না করতেন তাহলে আপনার বিয়োগ- ব্যথায় আমরা সবাই কেঁদে নয়নাশ্রু নিঃশেষ করে ফেলতাম আর তখন আপনার বিয়োগ- ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী ও আপনার শোক আমাদের নিত্য- সঙ্গী হয়ে যেত। এ বিয়োগ-ব্যথার দীর্ঘসূত্রতা ও শোকের নিত্যতা আপনার শানে আসলেই যৎসামান্য ও কিঞ্চিৎ (আমরা যদি দীর্ঘকাল আপনার বিয়োগ- ব্যথায় শোক প্রকাশ করতে থাকি তবুও তা যথেষ্ট হবে না)। কিন্তু এটি (আপনার মৃত্যু) এমনই এক বিষয় যা প্রত্যাখ্যান ও প্রতিহত করার উপায় নেই। আপনার জন্য আমার পিতামাতা উৎসর্গীকৃত হোক! আপনার প্রভুর সান্নিধ্যে আমাদেরকে স্মরণ করুন এবং আমাদেরকে আপনার স্মরণে রাখুন।"

**খুতবা ২৩৬**

আলী (আ.) হিজরতের পর মহানবী (সা.)- এর সাথে তাঁর সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর অবস্থা এ ভাষণে বর্ণনা করেছেন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর গমন পথ অনুসরণ করে চলতে লাগলাম এবং (যে পথের কথা মহানবী বলেছিলেন) তা স্মরণ করে আমি অগ্রসর হতে লাগলাম। অবশেষে আমি (মহানবীর নির্দেশ মোতাবেক) আল- আরজে(মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান।)পৌঁছে গেলাম।

# হযরত আলীর অত্যাশ্চর্যজনক বাণী

**বাণী নং ৯**

যুদ্ধের বিভীষিকা যখন তীব্র আকার ধারণ করত তখন আমরা সবাই রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর মাধ্যমে নিজেদের প্রাণ রক্ষা করতাম। কারণ (যুদ্ধের ময়দানে) তাঁর চেয়ে আমাদের মধ্যে আর কোন ব্যক্তিই শত্রুর অধিক নিকটবর্তী ছিল না।

**বাণী ৯৬ থেকে**

নিশ্চয়ই মুহাম্মদের বন্ধু ঐ ব্যক্তি যে মহান আল্লাহর আনুগত্য করে যদিও মহানবীর সাথে তার রক্ত সম্পর্ক দূরবর্তীও হয়; নিশ্চয় মুহাম্মদের শত্রু হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে মহান আল্লাহর বিরুদ্ধাচারণ করে, এমন কি সে যদি তাঁর নিকটাত্মীয়ও হয়।

**বাণী ৩৬১**

মহান আল্লাহর কাছে যদি তোমার কোন যাচনা (হাজত) থাকে তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা.)- এর ওপর দরুদ ও সালাম প্রেরণের মাধ্যমে মহান আল্লাহর কাছে (প্রার্থনা) শুরু কর। এরপর মহান আল্লাহর কাছে তোমার মনের বাসনা পূরণের জন্য প্রার্থনা কর। কারণ মহান আল্লাহ তাঁর কাছে দু'টি যাচনা পূরণ করার আর্জি পেশ করা থেকে অত্যন্ত মহান। তাই তিনি এ যাচনাদ্বয়ের মধ্যে যেটি মহানবী (সা.) ও তাঁর আহলুল বাইতের ওপর দরুদ ও সালামসম্বলিত তা সমাধা করে দেন এবং অন্যটি বাতিল করে দেন।

# চিঠি থেকে

## চিঠি ৯ থেকে

যখন যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করত এবং জনগণ ভয়ে দূরে সরে যেত তখন মহানবী (সা.) তাঁর আহলুল বাইতকে যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সামনে অগ্রগামী করতেন এবং তাদের মাধ্যমে তাঁর নিজ সাহাবীদেরকে শত্রুদের শানিত তরবারীর আঘাত ও কোপ থেকে রক্ষা করতেন। এ কারণেই বদরের যুদ্ধে উবাইদাহ্ ইবনে হারেস, উহুদের যুদ্ধে হযরত হামযাহ্ ও মুতার যুদ্ধে জাফর নিহত হয়েছিলেন।

## চিঠি ২৩ থেকে

তোমাদের প্রতি আমার ওসিয়ত : তোমরা মহান আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর পবিত্র সুন্নাহকে হারিয়ে ফেলো না (তাঁর সুন্নাহর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না)। এ দু'টি স্তম্ভকে তোমরা সুপ্রতিষ্ঠিত (রাখবে) এবং এ দু'টি প্রদীপকে চিরপ্রজ্জ্বলিত রাখবে।

## চিঠি ৬২ থেকে

মহান আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে সমগ্র বিশ্বের ভয়- প্রদর্শনকারী এবং পূর্ববর্তী নবী- রাসূলদের ওপর সাক্ষীস্বরূপ প্রেরণ করেছেন।

## তথ্যসূত্র

১. ইবনে আবীল হাদীদ প্রণীত শারহু নাহজিল বালাগাহ্, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫; আল বালাযুরী ও আল- ইস্ফাহানী থেকে বর্ণিত।

২. নাহজুল বালাগাহ্ আল খুতবাতুল কাসেআহ্।

## সূচীপত্র:

হযরত আলী (আ.) এর দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) . . . . . 6

মহানবীর জন্য দোয়া . . . . . 14

আহলে বাইত সম্পর্কে . . . . . 22

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য . . . . . 25

হযরত আলীর অত্যাশ্চর্যজনক বাণী . . . . . 43

চিঠি থেকে . . . . . 44

তথ্যসূত্র . . . . . 45